শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগপ্রবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড



ঢাকা-নবাবপুরস্থিত মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী বদান্যবর

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে তদীয় প্রেসে মুদ্রিত।

ফাল্গুনী গৌর-পূর্ণিমা, গৌরাব্দ ৪৪৪] [ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

কলিকাতা-বাগ্‌বাজার স্থিত
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঢাকা-নবাবপুর-স্থিত
মনোমোহন প্রেস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্তকর্ত্তৃক
মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

(বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সাল)

সূচীপত্র



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি

স্থান—হরি-সভা, চব্বিশপরগণা-বসিরহাট

সময়—প্রাতঃকাল, ২০শে বৈশাখ, ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

বক্তার দৈন্যময় আত্ম-পরিচয়

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে যিনি কথা বলিবেন, তাঁহার পরিচয় আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে আমার পূর্ব্ববর্ত্তি-বক্তৃ-মহোদয়ের পরিচয় অপর একজন দিলেন। আমার পরিচয় আমি নিজেই দিই। আমাদের গুরুদেব শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ ॥

মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নিঘৃ'ণ্য-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ-বিনা জগৎভিতরে॥"

—এই শ্রীগুরুদেবের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাষায় আমি আমার অধিকতর পরিচয় আর দিতে পারি না। আমি আমার সেই প্রভুর দাস্যাভিলাষী একজন জীব। কিন্তু এরূপ পরিচয়ে পরিচিত লোকের নিকট হইতে কি কেহ কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন? অযোগ্য ও অধম ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে ত' অযোগ্যতা ও অধমতাই লব্ধ হয়।

শ্রৌতনিষ্ঠা—উপাস্য-গৌরতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কেন?

আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য,—বিভিন্ন চস্‌মা-পরিহিত চক্ষু ও বিচার-দ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেবকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব-স্বরূপ আমরা দেখি না। বহুপ্রকার অযোগ্যতা-সত্ত্বেও আমাদের একটা বড় আশার স্থল আছে। যে পুরুষ "পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ" বলিয়াও জীবনে-মরণে চৈতন্যচিন্তা, চৈতন্যজ্ঞান, চৈতন্যধ্যান ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ইতরকার্য্যে ব্যস্ত নহেন, চৈতন্যকথামৃত ব্যতীত যিনি অপরকে অন্য কিছুই পান করান না, সেই মহাত্মার সেব্য-বস্তু—না জানি কত বড়, কত মধুর, কত উদার! এরূপ লোভবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে ও তাঁহার সেব্য-বস্তুকে দেখিবার ইচ্ছা করেন।

প্রকৃত অমানিত্ব-মানদত্বের স্বরূপ

আবার 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। কোনও বৈষ্ণবপ্রবর গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়-গামী ॥"

যাঁহাদের হৃদয়ে—"আমি বৈষ্ণব"—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' নহেন ; তাঁহাদের শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মশোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দৈন্যপ্রকাশ-দর্শনে অক্ষজ-বিচারে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা—ভীষণ অপরাধ

কেহ কেহ দুর্দ্দৈবাপরাধ-বশে বিচার করেন,—"গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, 'আমি অত্যন্ত অধম, আমি অত্যন্ত পতিত, আমি অত্যন্ত পামর, আমি নীচজাতি, অধম চণ্ডাল', তখন তাঁহার সত্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক আমিও তাঁহাকে 'অধমচণ্ডাল', 'পামর' 'নীচজাতি' প্রভৃতি বলিব বা মনে করিব।" এইরূপ অক্ষজ-বিচার অনেকেরই হৃদয় অল্পবিস্তর অধিকার করায় তাহারা বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের স্বরূপদর্শনে প্রতিহত হইয়া মহা-রৌরবের পথে চলিয়াছে।

বাস্তব-সত্য গুরুকৃপায় লভ্য

শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ;
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচল-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধা-যুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন ; কারণ, তত্তৎ

অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। "পরমসেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেস্থানেই মানবজ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

অধোক্ষজ-সেবন—বাধাহীন ও অহৈতুক

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১।২।৬)—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

শ্রীভগবান্—অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। **"অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা"** কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান—লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরি-ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞান-গম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই। 'অক্ষ' শব্দে 'ইন্দ্রিয়', সুতরাং 'অক্ষজ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী

ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই আমাদের শুদ্ধভক্তি আবৃত হয়। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহা-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান আমাদিগকে অসত্য-পথে ধাবিত করায়,—তখন "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। তখন দ্যূত, পান, স্ত্রী, মৎস্য-মাংস, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

'ষড়্‌রিপুকে 'প্রভু' সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই—যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না! আমার লজ্জাও হইল না! এতদিন কার্য্যের পরেও ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না! হে যদুপতে, আমার আজ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; আমি আর রিপুগণকে 'প্রভু' করিয়া তাহাদের সেবা করিব না। হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। ভগবানের সেবকাভিনয়ে বাহ্যজগতের যে সেবা করিয়াছিলাম, তাহা আর করিব না।'

মহান্তগুরু-প্রপ্তি

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট

দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ-লাভ হয় না।

উত্তম বা মহা-ভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না ; (চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ)—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি॥
সর্ব্বত্র স্ফূরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

অসদ্‌-গুরুরুবাশ্রয়ের কুফল

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন, কুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকেরই সেবা হয়, তাহাতে ভক্তি প্রতিহতা হন।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনার কারণ-নির্দ্দেশ

শ্রীব্যাসদেব যখন বহু পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন একদিন শ্রীব্যাসের অবসাদ দেখিয়া শ্রীনারদ আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়াছি, তবুও কেন হৃদয়ে প্রসন্নতা-লাভ হইল না?' সেই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে, (১।৭।৪-৭)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যকৃরূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব, বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক কর্ত্তৃত্বাদি-বশতঃ অভিমান সংসার-ব্যসন লাভ করে। জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেই সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তাহাও দর্শন করিলেন। এইসকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-নামক 'পারমহংসী সাত্বত-সংহিতা' রচনা করিলেন—যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

নাম ও নামাপরাধ

ভজনশীল প্রাপ্ত-সেবন ব্যক্তির শোক, ভয় ও মোহ নাই। যখন 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি-বশতঃ নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং 'হরিনাম (?) যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল'—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবর্গ-লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারাই নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া ভ্রম করেন। 'দেবদারু-পত্র' (সম্মুখস্থ উক্ত বৃক্ষের পত্রদ্বারা সজ্জিত তোরণ দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিতেছেন)—এই নামটীর ও 'দেবদারুর পত্রের পত্রত্বে'র মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ-

জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা-নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না; নামাপরাধ দূর হইলে কোনও-সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না; উহা-দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত-ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই। 'লোকস্যাজানতঃ'—ভাগবত-প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক-সত্যের কথা মানবজাতি জানে না। মূর্খলোকের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্ত্তন ও সুপঠন হয়। ভক্তভাগবতের মুখে গ্রন্থভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে জীবের যাবতীয় কুহক ও মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়। ভগবদ্বিমুখ-জগতে নানা-শাস্ত্র প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট-কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদি-প্রাপ্তির লোভ বা প্রতিষ্ঠাশাদিসমূহ অন্যাভিলাষ আনিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না,—নামাপরাধ-ফল-মাত্র আমাদের লভ্য হইবে।

অভক্তিযোগসমূহ ও উহাদের স্বরূপ-বিচার

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিই অভক্তিযোগ। উহারা কখনও অপ্রতিহতা অহৈতুকী মুকুন্দসেবা নহে। 'চব্বিশঘণ্টার

ভিতরে চব্বিশঘণ্টাকাল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য হইতে পারে না'—জীবের যখন এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি ব্যাসদেবের ন্যায় জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেব-দেবীর পূজা করেন না। তিনি "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ"—এই ভাগবতীয় বাক্যটী জানেন। অপূর্ণ বস্তুর পূজা দ্বারা অন্য অপূর্ণ বস্তুর ঈর্ষা উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণে পরমপরিপূর্ণতা বিরাজমান। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নাদি অথবা মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত—গর্হিত ভাবে পশ্চাদ্দেশে। অসুরমোহনার্থ ভগবান্ শাক্যসিংহের 'প্রকৃতিতে নির্ব্বাণ' বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ-প্রচার, বা 'ঈশ্বরকৃষ্ণের' সাংখ্যকারিকা-লিখিত 'প্রকৃতিলয়' প্রভৃতি যে-সমস্ত কথা, তাহা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া বা প্রকৃতি পূর্ণপুরুষত্বের কোনরূপ হানি করিতে পারে না, কিন্তু 'মায়া' বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করে না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীরূপা বৃত্তিদ্বয়ী-দ্বারা জীবকে আচ্ছাদন করেন। মায়া সর্ব্বদা পূর্ণপুরুষের প্রসাদ-প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা নিষ্কপটভাবে পূর্ণ-পুরুষের প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকেই অভিভূত করিয়া থাকেন।

জীবের একমাত্র কৃত্য

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

পঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবা

হৃদয়ের সুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সাধন করিয়া প্রকট বা পরিস্ফুট করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার-রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতির দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি-লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবা তাদৃশী নহে; কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত শ্রীকামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ও অপ্রাকৃত মনের কার্য্য। জড়-মনের যাবতীয় কার্য্য-সমূহ বহির্জ্জগতের আশ্রয়ে সংঘটিত হয় (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)—

"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়॥
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

আরোপবাদ ও স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব

আরোপের বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহের দ্বারা নশ্বর চেষ্টার অনুরূপ তথা-কথিত কৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ কখনও বলেন নাই। আমরা যে আব্‌হাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বুঝান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে মনোবৃত্তির ক্রিয়ার আধারকে পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধদেহের ভূমিকায় নিয়োগাভিপ্রায়ে (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)—

"মনে নিজ-সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন চিন্তে' রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"

প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ-জগতের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের দ্বারা অপ্রাকৃতবস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণবস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখন বাহ্য-দেহে তাহার স্পন্দন-ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন, সেই শ্রীরূপের পশ্চাতে অনুগমন না করায় আমাদের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। তখন (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥"

অর্থাৎ 'পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা, বিটপীসকল ও ভারাবনত কৃষ্ণ-প্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতিরাজি, আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।' (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মহাভাগবত এইরূপ মনে করেন,—'সকলেই বিষ্ণুর উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণু-বিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না!'—যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ)—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

হায়, কৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নাই! তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন-দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গধারণ বৃথাই হইতেছে মাত্র। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ)—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে',—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

অপ্রাকৃত ভাববিকার বাহিরে বিজ্ঞাপনের পণ্য নহে

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আড়াইল-গ্রামে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভ-ভট্টের বিচারপ্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু স্বীয় ভাব সম্বরণ করিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈলা।
দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা ॥"

আবার একদিন রায়-রামানন্দের সহিত মিলনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বিচারপ্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮মপঃ)—

"বিজাতীয় লোক দেখি, কৈলা সম্বরণ।"

"আপন-ভজন-কথা না কহিবে যথা-তথা"—ইহাই আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহ্যাদপি গুহ্য রাইকানুর রসগানের পদাবলী যদি আমাদের

মত লম্পট-ব্যক্তি হাটে-বাজারে ঘাটে-বাটে-মাঠে যা'র-তা'র কাছে গান বা বর্ণন করে, তবে কি উহা-দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহ্য-জগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্রও ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে?—একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যায়।

ভজনক্রম-বিচার

ইহা-দ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকারানুযায়ী ক্রমপথানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে ভজনক্রিয়া ব্যতীত গতি নাই

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্য-দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃতসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান-পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত-গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই

শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভা-দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি-চেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

গৌরগণে গণিত ব্যক্তির স্বভাব

প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকরমধ্যে গণিত হইলে জীবের আর প্রেমদানলীলা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য থাকে না। তখন শ্রীগৌর-সুন্দরের—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাণী স্মরণ করিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্রের যে আজ্ঞা—সেই আজ্ঞার বাহক-সূত্রে 'পিয়নের' কার্য্য করিতে থাকিব তখন সকল-জীবের দ্বারে-দ্বারে গিয়া বলিব,—

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥"

তখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের (৯০ সংখ্যা) অনুসরণে এই বলিয়া ভিক্ষা করিব,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আত্মার নিত্যবৃত্তি

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিদ্বৎ-সভা, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা, শনিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান অবরোহ-পথেই লভ্য

আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়—"আত্মার নিত্যবৃত্তি।" কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞানলাভ দুইপ্রকারে সাধিত হয়। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ ধারণায় বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়জ-ধারণায় আরোহবাদাশ্রয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে বস্তুর যে কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা-দ্বারা বাস্তব-সত্য বস্তু নির্ণীত হয় না। কিন্তু বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্য-সত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহা-দ্বারা সূর্য্যের যে দর্শন-লাভ হয়, তাহাই সূর্য্যসম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-জ্ঞানই বেদ্য।

অক্ষজ-জ্ঞানের সংজ্ঞা ও অক্ষজ-জ্ঞানীর পরিণাম

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নহে;—যেমন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক

অপরিপক্কবুদ্ধি কোন বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোন মধুরতাই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণতবয়স্ক পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারি-ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান—পরিবর্ত্তনশীল বা কালক্ষোভ্য ; উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান অধিক, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক, অশীতি-বর্ষ বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষ বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক ; আবার, শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা কেহ যদি সহস্রবৎসর পরমায়ু এবং তদপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্র-বৎসর অধিক পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেইপরিমাণে তত অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব-জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ বা নানা-প্রকারে অধিকতর দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য, সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তবজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নামই অধিরোহ বা অক্ষজ জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়াই বলিয়াছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

—হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তি

না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধা নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধন-ষট্‌ক-ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিলেও সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়।'

বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান আরোহ-পথে লভ্য নহে ; আরোহ-বাদের সংজ্ঞা

অধিরোহ-বাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয়বস্তুর লাভ হইয়া গেলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে ; এমন কি, তাঁহাদের ধারণা,—উপায় এতদূর অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই 'রক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। নীচ হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টার নাম অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহপূর্ব্বক জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম—'আরোহবাদ'; উহা-দ্বারা বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান-লাভ হয় না। বাস্তব-বস্তু অনেকসময়ে কল্পনার ছাঁচে কাল্পনিক বস্তুরূপে গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

অবরোহ-বাদের সংজ্ঞা

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন ইহাতে কোন বাধা নাই ; ইহা—নির্ব্বাধ-জ্ঞান। যেমন পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্য যেস্থানে আছে, সেইস্থান হইতেই সূর্য্যালোক নির্গত হওয়ায়, সত্যিকার আলোকের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তদ্রূপ বাস্তব-বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকটে অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তব-বস্তু দর্শন করাইতেছে ; ইহারই নাম—

'অবতারবাদ'। স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট বাস্তববস্তু যখন নিজেই তাঁহার স্বরূপ প্রপঞ্চে নির্ব্বাধ ও অবিকৃতরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান-লাভ হয়; ইহারই নাম অবরোহবাদ বা অধোক্ষজ-সেবা-পথ।

আত্মতত্ত্ব-বিচার; অনাত্ম কুবিচার—

(১) স্থূল-দেহে আত্মবোধ

"আত্মার নিত্যবৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ 'আমি'। এই 'আত্মার' বা 'আমি'র বিচার করিতে গিয়া প্রথম-মুখে বহির্জ্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই 'আমি'। 'স্থূলদেহ-ই আমি' এইরূপ অনুভূতি আসিলে আমরা স্থূলশরীরকেই নানা-প্রকারে সাজাইয়া থাকি; ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল থাকার জন্য ব্যস্ত হই;—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্‌" এই মন্ত্র-সাধনই তখন আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

(২) সূক্ষ্ম-দেহে আত্মবোধ

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই 'আমি' মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যস্থিত চেতনের বৃত্তিটুকুকে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে সূক্ষ্মশরীরকেই 'আমি' বলিয়া বিচার করি এবং নানা-প্রকার বাহ্যক্রিয়া-কলাপাদি-দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিবিধান-কল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়,—'কেবল নিজ স্থূলশরীরেই 'আমিত্ব' আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'-কে কিছু বিস্তার করা যাউক'; তখন আমরা ভাবি,—'হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত

পালন এবং জগদ্‌বাসীর স্থূলশরীরের উপকার করা কর্ত্তব্য, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করা আবশ্যক, সমাজের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ করা দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান—একটা ভাল কায, সামাজিক-বিধি বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার বা দর্শন-শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক' ;—এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা-স্রোত ও ক্রিয়া-কলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন ঐসকল বিচার-চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপই আমাদের নিত্য-বৃত্তি বলিয়া মনে হয়।

বেদাদিশাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব-বিচার

কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, (গীতা ২।২০,২২)—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

অনাত্ম উপাধিদ্বয়ের ধর্ম্ম

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর—এই দুইটী উপাধি বা অনাত্মবস্তু। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল ; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর প্রণয় ও বিবাদ-বিসম্বাদ বা রাগ ও দ্বেষ বিরাজমান। স্বার্থসিদ্ধির

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই 'বিবাদ' এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলেই 'প্রণয়'। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি,—প্রতিমুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, বালকের দেহ, কিশোরের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ ও বৃদ্ধের দেহে রূপগঠন—পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতি-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন ও নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় "আমি" বস্তুকে আবরণ করিয়া ইতর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সমবর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহা-দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে তবে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে। অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতনভাবকে আমরা অনেক-সময় "আমি" বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন—স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে মন 'আমি যাহা নই', তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন-বস্তুর দর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন কেবল-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,—অচেতন-ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণ-ফলে কেবল-চেতনধর্ম্মযুক্ত বস্তুর দর্শনে অসমর্থ। আত্মা কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামি বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি একসময়ে মূর্খ, একসময়ে পণ্ডিত, একসময়ে নিদ্রিত ও একসময়ে জাগরূক থাকিই বা কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন-বৃত্তি নাই।

শুদ্ধ আত্মবৃত্তি

আত্মার বৃত্তি—একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন; আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহার-ফলে পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ডবস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি লুপ্ত'—এ'কথাও ঠিক নয়; কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও লুপ্ত থাকে না; চেতনের বৃত্তি—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলা; তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মার বৃত্তির যথার্থ ব্যবহার।

বিমুখ বদ্ধজীবের বা মনের ধর্ম্ম

যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখনই আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে; তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য-বস্তুতে ধাবিত হইতেছে—এইমাত্র; যেমন, 'আমরা যদি কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া-ষ্টেসনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহ-ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেসনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, শারীরিক চেষ্টা-মাত্র করা হইল; কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথে পৌছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত করার ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,—আত্মার বৃত্তিটী আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান-কালে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর জড়বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। 'আমি'র বা আমার অনুশীলনীয়—একমাত্র 'পরম'+'আত্মা'; কিন্তু বর্ত্তমানকালে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম (অবম) বস্তুর অনুশীলন হইতেছে; নাসিকা এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু এখন

কুরূপ দর্শন করিতেছে,—ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োগে এখন ভুল হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানকালে 'আমার সুখ' ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক-মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, তাহা হইলে আমাকে সুখভোগাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাই,—সুন্দর দন্ত, প্রখরদৃষ্টি চক্ষু, সকলই নষ্ট হইয়া যায়; বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। আসব অর্থাৎ মদ্য এক-ক্ষণের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

বিমুখ দেহ ও মনের ভগবদ্‌কার্য্যের ফল

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে;— তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-বৃত্তির অপব্যবহার-ফলেই এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কোন মহাজন কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনো-বাক্যে সেই মহানুভবের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়; (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া-সমূহ যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সমস্তই আমাদের দেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। কিন্তু আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

আত্মবৃত্তি-বিষয়ে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর ধারণা

তবে, 'আত্মার বৃত্তি কি ?'—এই বিষয়ের অনুসন্ধান-স্পৃহা আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—কেবল চেতনভাব বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড়ত্ব নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে 'নাস্তিকতা' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা—চেতনধর্ম্মযুক্ত ; চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায় ? রূপদর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, রসাস্বাদন, ত্বক্‌স্পর্শ ও শব্দশ্রবণাদির ফলে আনন্দের উদয় হয়। যেস্থলে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেস্থলে 'আস্বাদ্য' 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদন'-ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেইস্থলে আনন্দের উপলব্ধিই বা কোথায় ? ত্রিগুণাত্মক আমি দোষযুক্ত বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত আমি—নিত্য সত্য ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্য-বিচারে যদি উপাদেয় বস্তুই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত'—প্রস্তরাদি অচেতন বস্তুতেও রহিয়াছে ! জড়দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে,—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্মবঞ্চনা-মাত্র ;—যেমন, আমার একটী ফোড়া হইয়াছে ; আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমায় ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে নিরাময় করিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন,—"তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলেই ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।" ফোড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ

করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্যও নাশ বা অস্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ কুবিচার মূর্খতা-মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 'আমি'র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নাশ করা কখনও বিধেয় নহে; 'আমি' নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের নিত্যসত্য বৃত্তি আত্ম-বিনাশকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যবৃত্তি। আরোহবাদ-দ্বারা-লব্ধ নির্ব্বিশিষ্ট-ভাব—নাস্তিকতা-মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে; উহা ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া কথা মাত্র। আমি আর যাইতে পারি না বলিয়া যাইতে যাইতে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া নির্ব্বি-শেষ-ভাবকে বরণ করা—একটা জাগতিক অনুমান-প্রসূত কষ্টকল্পনা-মাত্র অনাত্মবস্তুর দোষসমূহকেও আত্মবস্তু-মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা-সমূহকেও চিদ্বিলাসমধ্যে কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প-মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন কখনও "নিত্য-বৃত্তি"-শব্দ-বাচ্য নহে। 'আমি' জিনিষটী 'পরম আমার' অনুসন্ধান করে—'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

আত্মানুশীলনের উপায় ও শ্রুতির উপদেশ

জগতের বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ-পর্য্যন্ত 'দাবা' খেলিতে পারি, কিন্তু তাহা-দ্বারা বাস্তব-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথা-দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের "কেন কং বিজানীয়াৎ" মন্ত্রে অনাত্মনিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্ম-বস্তুতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ বিচার নিরসন করিবার জন্যই শ্রুতির উক্ত মন্ত্র; কারণ, বৃহদারণ্যকশ্রুতি

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারাই আত্মার অনুশীলন-কর্ত্তব্যতার কথা বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অপাণিপাদঃ" মন্ত্রসমূহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্যসেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অনাত্ম বদ্ধানুভূতির কার্য্য

জড়জগতে একটী মাটীর জিনিষ অপর একটী মাটীর জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না এবং দুইটী মাটীর জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা—প্রয়োজক কর্ত্তা, জীবের তাৎকালিক বদ্ধাভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করা'ন। তখন বদ্ধজীবের দর্শনে জগদ্রূপি-ভগবান ভোগ্য হইয়া পড়ে। "ঈশাবাস্য"-শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে,—'জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য, 'কুক্কুর-দন্ত' হইয়াছে মৎস্য-মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য।' অনাত্মবৃত্তিতে 'আমি'—বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহু আশ্রয়ের 'বিষয়' ও বহু বিষয়ের 'আশ্রয়' এবং বহুস্থানের মালিক। এইরূপ অসদ্-বুদ্ধিতে জীবগণ নিজদিগকে 'কর্ম্মফলের ভোক্তা' কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা-বশতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার নিমিত্ত সমগ্রজগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা, সকলেই প্রথমেই জানিতে চা'ন,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্মবৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। 'আমার ভোগ' 'আমার সুখ' 'আমার শান্তি' 'দেহি'-'দেহি'-রবে জগৎ পরিপূরিত;—কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা একবারও ভুলক্রমেও কীর্ত্তন করে না।

যে-দিন 'হৃষীকেশের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য' বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেইদিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র কৃত্য

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র নিত্য-কৃত্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' শ্রুতি-মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে এবং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' এই গীতোপনিষদ্বাক্যে 'পরম সমতা' উপদিষ্ট হইয়াছে।

"মুক্তাঃঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

—শ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনির এই বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীধর-স্বামী মুক্তকুলেরও নিত্য-সেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে যত অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেই সমস্ত অস্মিতার দ্বারা পরমপুরুষেরই সেবা হওয়া উচিত; আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে দেব, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যতপ্রকার অস্তিত্ব, তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোনই কৃত্য নাই। অন্য সমস্ত ক্রিয়া 'আত্মবৃত্তি' শব্দ-বাচ্য নহে; কেন না, অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচয় ও ফল

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের চিন্ময়ী ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যেদিন আমরা স্বরূপে মধুর-রতিতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যেদিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের শুদ্ধচিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা কেবল শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। তখন প্রাজাপত্য-ধর্ম্ম আমাদিগকে

টানিয়া রাখিতে পারিবে না এবং লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ, দুস্ত্যাজ্য আর্য্য-পথ, নিজ-স্বজন-পরিজনাদির তাড়ন-ভৎর্সন প্রভৃতি কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনা গোপীর ঐকান্তিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তখন ভগবানের শ্রীনাম-মধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে; চেতন-চক্ষুর্দ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়নপথের পথিক হইবে; সেই পরমাশ্চর্য্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব—ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব;—বাহ্যজগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্ম্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা নিত্যবৃত্তি লাভ করিয়া স্থায়িভাব রতিতে আলম্বন ও উদ্দীপনরূপ বিভাব এবং অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্ববিধ অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরম-পীঠ-লাভ হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

শুদ্ধ মুক্ত আত্মার পঞ্চরতিভেদে পঞ্চরসের বৈচিত্র্য-ভেদ

আত্মবৃত্তি—পঞ্চবিধ-রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্ত-রসটী প্রতিকূলভাব-বিহীন একটী নিরপেক্ষ অবস্থান-মাত্র। দাস্য-রস—কিয়ৎপরিমাণে মমতা-যুক্ত; সুতরাং তারতম্যবিচারে দাস্যরস—শান্তরসের গুণ ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত; ইহাতে দাস্য-রসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই, বরং উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজমান।

বাৎসল্য-রস—দাস্য-রস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম বিষয়বস্তুকেও 'পাল্য' বা 'আশ্রিত' বলিয়া জ্ঞান হয়। মধুর-রস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারি-রসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ-রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। জীবের আত্ম-স্বরূপবিচারে আমরা শুনিয়াছি (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

পরমাত্মা ও আত্মার সম্বন্ধ এবং মায়াবাদ

শ্রুতিমন্ত্রে যে 'আত্মরতিঃ', 'আত্মক্রীড়ঃ' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্য-কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। 'রন্জ্'-ধাতু হইতে 'রতি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'রনজ্'-ধাতুর তাৎপর্য্য —'অনুরাগ' বা 'টান'। 'আত্মা'-শব্দে 'আমি' ; 'পরমাত্মা'-শব্দে 'পরম—আমি' অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভব-শক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃসত্তাধিষ্ঠানে কৃষ্ণের পক্ষেই সমগ্র পরম-আমিত্বের নিত্যাভিমান। বিষয়বিচারে কৃষ্ণেরই 'পরম-আমি'-বিচার, আশ্রয়-বিচারে বিভুচৈতন্যের অধীন প্রভু-বাধ্য অণুচিৎ 'ক্ষুদ্র আমি'। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাস্তব বস্তু—এক অদ্বিতীয় ; তাহাই 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব' অর্থাৎ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যযুক্ত অদ্বয়-তত্ত্ব। 'পরম-আমি'র বা বিষয়তত্ত্ব 'আমি'র স্বার্থ পূরণ করাই নিত্যাশ্রিত অস্মিতার নিত্য-বৃত্তি। কিন্তু এইস্থানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ সাযুজ্যমুক্তিকেও নিত্যভক্তির অন্তর্গত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'পরম-আমি'র সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়াই অর্থাৎ অদ্বৈত বা সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করাই 'আমি'র সালোক্যাদি-লাভের ন্যায় অন্যতম স্বার্থ। কিন্তু ইহাতে নিত্য-চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য অত্যন্ত বাধা পাইতেছে

সুতরাং এইরূপ বিচারের মূলে হৈতুক ভোগবাদ নিহিত। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তদনুগত শ্রীধরের শুদ্ধবিচারের সহিত মায়াবাদীর বিচারের এইস্থানে ভেদ। শ্রীধরের এই শুদ্ধসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া অক্ষজজ্ঞানিগণ 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' শ্রীধরকেও মায়াবাদী বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদীর তদীয়সর্ব্বস্বভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিশিষ্ট-ব্রহ্মবাদ লোকে বুঝিতে ভুল করিয়াছিল বলিয়াই সুদার্শনিকরূপে শুদ্ধ-দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

কৃষ্ণপাদপদ্মই নিত্যসত্য বাস্তব বস্তু

নিত্যসত্য—বাস্তব সত্য,—পরম-সত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যেই আবদ্ধ। রসময় রসিকশেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্ত জনগণের শ্রীচরণে কোন ভাগ্যবলে একবার চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই দুর্ল্লভাদপি-দুর্ল্লভ সেবায় অধিকার পাইব। সেদিন আমাদের কবে হইবে?

শ্রীগৌরচন্দ্রের উপদেশ

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা মানব-জীবনের কর্ত্তব্য জানিতে পারি। তিনি জাগতিক অভ্যুদয়ের কোন ব্যবস্থা-পত্র দেন নাই,—তিনি জড়-জগতের মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠার আশা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহাকে মহত্ত্ব প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অপরে আক্রমণ করিলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আক্রান্ত হইতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন কর।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ও তাহার অর্থ

"চেতো-দর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

'চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন'-শব্দের দ্বারা চিত্তদর্পণে কুদার্শনিকের মতবাদ ও কৈতব-রাশির এবং প্রাক্তন অনর্থ ও অভদ্ররাশির অপসারণ সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে যাবতীয় অন্যাভিলাষ ও কুদার্শনিকের মতবাদ বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রমত্ততা-রূপ মহা-দাবাগ্নিজিহ্বা নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌কীর্ত্তন চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অখিল-কল্যাণ-রূপ কোমল কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূর প্রাণ-পতি, প্রতি পদে-পদে কীর্ত্তনকারীর আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকারী, অপ্রাকৃত পীযূষাস্বাদপ্রদাতা, প্রেমবিধাতা ও সুপর্ণবিশিষ্ট আত্মবিহঙ্গমের চিদাকাশে চিদ্বিলাস-সেবা-স্বাধীনতা-প্রদাতা.

বিমুখজগতে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ

কিন্তু বিমুখ-জগতে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই! অনাত্ম-প্রতীতিতে কিছুতেই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না,—অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই বহুমানন হইয়া থাকে। এই বিমুখ জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণের কীর্ত্তনকে—মায়ার কীর্ত্তনকেই 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণনাম-ব্যতীত জগতে ভব-ব্যাধির আর কোন ঔষধ নাই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

বিমুখ-জগতে নানাবিধ নামাপরাধ-প্রক্রিয়া-বর্ণন

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি বা পন্থা নাই। বর্ত্তমান-সময়ে হরিনামের মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত!—এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণের দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাশা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! কিন্তু হরিনাম—জড়-ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহেন। বর্ত্তমান-কালে কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত! অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের পর আবার খাওয়া-দাওয়া-থাকার কথা, আবার বাদ-বিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে আর 'অষ্টপ্রহর' বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই 'অষ্টপ্রহর',—নামাপরাধ-গ্রহণ কখনও 'অষ্টপ্রহর' নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। বর্ত্তমানের বিকৃত 'অষ্টপ্রহর'-রীতিতে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তিত হয় না,—মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শুদ্ধনামকীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান-কালে মায়ার সংকীর্ত্তনকে 'কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বলিয়া জগতে প্রবঞ্চনা বা জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

বিষ্ণুতত্ত্ব ও শক্তিত্রয়ের বিচার

ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিশক্তিধৃক্। বেদ বলেন,—"ত্রেধা নিদধে পদম্।" 'অন্তরঙ্গা' 'বহিরঙ্গা' ও 'তটস্থা' শক্তিত্রয়ই বিষ্ণুর তিনটী পদ। আমরা ভগবানের এই তিনটী শক্তিকে ভুলিয়া যাওয়ায় ভগবানের ত্রিবিক্রমত্ব বুঝিতে পরিতেছি না। কৃষ্ণকে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি, তাহাতে আমাদের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ হয়। তদ্দ্বারা অমুক বড়লোক, অমুক অর্থদাতা, অমুক দেবতা সন্তুষ্ট হইবে,—এরূপ নহে। কৃষ্ণবস্তুকে অন্তর্গত করিবার চেষ্টা—মায়াবদ্ধজীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ জড়েন্দ্রিয়ের অগ্রসর করিয়া যোগাইয়া দেওয়া-মাত্র।

বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষত্বে বিশ্বাসী নামাপরাধীর বিচার ও গতি

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত এই যে, 'ভগবানের হাত, পা, চক্ষু, নাক, শরীর সব কাটিয়া দেও (!), ভগবানের সমস্ত ভোগ কাড়িয়া লও (!), যত ভোগের যন্ত্র ও ভোগের উপাদান মানুষ, পশু, পক্ষী বা যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাদির জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয় প্রবৃত্তিই—বিষ্ঠার তাজা ও শুক্না অবস্থাদ্বয়; উভয়ই নিত্যকল্যাণার্থীর পরিত্যাগের বস্তু। 'কৃষ্ণ'—একজন ইতিহাসের মানুষ, 'কৃষ্ণ'—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের একজন বস্তু'—এইরূপ বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজন হয় না, মায়ার ভজন হইয়া থাকে। 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি লইয়া কোটি-কোটি বৎসর ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিলেও শ্রীনামের কৃপা-লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ),—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবুত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

মনুষ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা কোথায় ?

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৩২

মানুষ ও পশুর তুলনা

সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, 'মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ?' বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিতোষণেই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ও যোগ্যতা রহিয়াছে। যদি বল, মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচারশক্তি অনেক-সময়ে অনেকানেক পশু-পক্ষীতেও লক্ষিত হয়। কিন্তু পশু-পক্ষিগণের বিচারশক্তি থাকিলেও উহাদের দূরদর্শন নাই। এই দূরদর্শন হরিতোষণে পর্য্যবসিত হইলেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়াদি ব্যাপার—পশুতে ও মানুষে সমান। পশুকে চাবুক দেখাইলে পশু ভীত হয়, গায় হাত বুলাইলে পশু সন্তুষ্ট হয় ; কিন্তু পশুরা পূর্ব্বের কথা জানে না, পরের কথাও জানে না। অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক বস্তুর সাহায্যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথায় পশুদের অধিকার নাই।

'ভজন' ও 'পূজন'-শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ

মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋক্‌সংহিতা'য় আমরা পূজ্য, পূজক ও পূজা-বিষয়ক নিদর্শন পাই। ঐ সংহিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত রহিয়াছে। স্তবকারিগণ তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমরা ঐ আদিম সভ্যতার গ্রন্থ হইতে 'পূজন' কথাটী জানিতে পারি। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের পূজন করা কর্ত্তব্য, আনুগত্য-ধর্ম্মই 'পূজন', শ্রেষ্ঠ বস্তুই পূজ্য। পূজক যে পূজ্যের অধীন এবং পূজন-ক্রিয়া যে আনুগত্য-সূচক, এইসকল কথা উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

বহ্বীশ্বরবাদ ও পঞ্চোপাসনা-মূলক মায়াবাদের সম্বন্ধ

পরবর্ত্তি-কালের বিচারে বহ্বীশ্বরবাদ (Polytheism) বা পঞ্চোপাসনা (Henotheism) ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া 'অহংগ্রহোপাসনা' (Pantheism)-রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে বহু বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য-বস্তুর দর্শনে বহু-দেবতা-পূজার সূচনা। এই বহ্বীশ্বরবাদ হইতেই ক্রমশঃ নশ্বর-বৈচিত্র্যে অবস্থিতিকালে 'অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয়' বা 'মায়াবাদ' অর্থাৎ বহু হইতে চরমে কোন-একটী চিদারোপিত জড়-নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থায় আরোহণ-চেষ্টা জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হয়।

বিষ্ণুর পারতম্য-বিচার

আবার, বহু শ্রেষ্ঠ বস্তু বা দেবতাকে পূজ্য-জ্ঞান হইলেও ঐ বহু শ্রেষ্ঠ দেবতা যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য জ্ঞান করিয়া পূজা বিধান করেন, এবং যিনি অসমোর্দ্ধ, ঋঙ্মন্ত্র তাঁহাকেই এই বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন (১।২২।২০)—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ সূরিগণই সেই বিষ্ণুর পরম নিত্যপদ নিত্যকাল দর্শন বা সেবা করিয়া থাকেন।

ঋক্‌সংহিতায় এরূপ কোন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যাহা—বিষ্ণুর পরম পদ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেবতার পূজা, শ্রেষ্ঠ, ধনী, বলবান্, পণ্ডিত, কুলীনের সম্মান অর্থাৎ আমা-হইতে শ্রেষ্ঠ-বস্তুর প্রাপ্য সম্মান-প্রদান—কিছু দোষাবহ কার্য্য নহে; কিন্তু স্বতন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ ঐ দেবগণের ভগবদ্দাস্যের বা বৈষ্ণবতার অভাবকে পূজ্য-জ্ঞানে পূজা করাই দূষণীয়। উহা-দ্বারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অদ্বয়-বস্তুর সেবা হয় না, পরন্তু বেদান্তবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

বিষ্ণু পূজা ও ইতর-দেব-পূজায় পার্থক্য

তত্ত্ব-বস্তু—এক ও অদ্বিতীয়; উহাই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বস্তুটী কি, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থ হইতে জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীব্যাসদেবও পদ্মপুরাণে সেই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদধীন তত্ত্বকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞানের অভাব হইয়াছে; কিন্তু বাস্তব অদ্বয় পূজ্যবস্তুর শক্তিমত্তার অভাব হয় নাই; (গীতা ৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

মূল বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তুর অধীনতত্ত্ব হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি যে সম্মান দেখান হয়, তাহা ফলতঃ অদ্বয়বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু পূজকের উক্ত কার্য্যটী অবৈধ। সেইরূপ অবৈধ-কার্য্যের দ্বারা পূজক কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। সকল বস্তু যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্। 'গৃহপতির দ্বারদেশে অবস্থিত ভৃত্যই গৃহপতি'—এইরূপ মনে করিলে গৃহপতির সন্ধান সুষ্ঠুরূপে হয় না। ঐরূপ মনে-করা-রূপ ভ্রান্তিটী 'অবিধি'; কিন্তু বস্ত্বন্তরের ধারণার পরিবর্ত্তে পূজ্যবোধে বাস্তব-বস্তুর পূজা-কার্য্যটী কিছু অবিধি নহে।

বৈষ্ণবের মানদধর্ম্ম ও দেবপূজা

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদ-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানদধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের বস্তুর কামনা-হেতু হৃদয় মৎসর থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন জিহ্বাগ্রে উদিত হন না। বৈষ্ণবগণ—নির্ম্মৎসর,তাঁহারা—মানদ; সুতরাং অন্যান্য দেবতা বা জাগতিক শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের যথোপযুক্ত সম্মান দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না; তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল দেবতা ও জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণসম্বন্ধ বাদ দিয়া কাহাকেও সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। বাহ্য-জগতের কর্ম্মিগণ এরূপ তাৎকালিক সম্মান প্রদান করিলেও, উহা তাহাদের মৎসর হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা-মাত্র।

বিষ্ণুর পারতম্য ও পরমেশ্বরত্ব

ঋকের স্তব যদি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি, তবে দেখি যে, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" কথাটী ঋকের মূল কথা। যদিও অন্যান্য দেবগণ বিষ্ণুর সহিত দেব-পর্য্যায়ে গণিত হইয়াছেন, তথাপি বিষ্ণুর তুরীয় পদই 'পরম পদ'; তাহাই সূরিগণের নিত্যসেব্য। আবার, ঐসকল দেবতা পরতত্ত্ব অদ্বয় বিষ্ণুরই বিভিন্ন শক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা কিছু অযৌক্তিকও নহে। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। আমরা অনেক-সময় মাতাপিতাকে "প্রত্যক্ষ দেবতা'' বলিয়া থাকি; অধিকতর শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'দেবতা'-নামে অভিহিত করি, কিন্তু তাঁহারাই কি পরমেশ্বর? তাঁহাদের উপর আর কি কেহ ঈশ্বর নাই?—এইরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা পরমেশ্বর নহেন। তাঁহারা বিষ্ণুর অংশাংশ-তত্ত্ব; ভগবানের কোন-কোন গুণ বা বিভূতি বিন্দুবিন্দু-পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অসমোর্দ্ধ পরমতত্ত্ব-বস্তুর ন্যায় একচ্ছত্র-শ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য অন্য কাহারও নাই। এইজন্যই বিভিন্ন দেবতা-গণ প্রাকৃত-লোকসমূহের দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের দৌড় (পরিমাণ) ও যোগ্যতানুসারে 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া বিবেচিত হইলেও সূরিগণ অর্থাৎ পূর্ণ-প্রজ্ঞ-ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বিষ্ণুর তুরীয় পদই 'পরম পদ' বলিয়া সেবিত। তাই পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ প্রাচীনতম বেদমন্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণ-দ্বারা বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অক্ষজধারণা-মূলক নির্ব্বুদ্ধিতা

অন্যান্য অবিকুণ্ঠ ও অব্যাপক বস্তুকে ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা দর্শন করিতে করিতে আমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়াছে যে, সেইরূপ ধারণা ও সেইরূপ বুদ্ধি আমরা বৈকুণ্ঠ বা ব্যাপক-বস্তু অর্থাৎ আমাদের অক্ষজ-ধারণার অগম্য অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুর উপরও প্রয়োগ করিতে ধাবিত হই।

মানবের শ্রেষ্ঠতার কারণ ও পরিচয়

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মানুষ শ্রৌতপথ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাজনগণের প্রদর্শিত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিতে পারে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জীব সুদুর্লভ অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ মানব-জন্ম লাভ করেন। সুতরাং ভগবৎসেবাই যে মানব-জন্মের একমাত্র কৃত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের চরম ফল। এই গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, নতুবা পশুত্বের দিকে অধোগতিই হইবেন। ভগবানের সেবার কথা বাদ দিয়া যে 'আমি',—যে 'আমি' নিত্য-ভগবানের নিত্য-দাস নহে, সেই নশ্বর 'আমি'র কখনও সুবিধা বা মঙ্গল-লাভ হয় না।

সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণাভাবেই দেহ-মনো-ধর্ম্মের বিক্রম

হরিকথার দুর্ভিক্ষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন,—এমন বান্ধব কে আছেন? মানুষ-জাতি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর দুর্বিবেকী যে, কুসিদ্ধান্ত-বাক্যগুলিকে 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করিবার দাম্ভিকতা করেন এবং হিতাহিত-বিবেচনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা পশু-স্বভাব ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার সুবিধা পাই, তবেই আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। মানুষ ঐরূপ অসৎসঙ্গে পতিত হইলে কখনও খুব প্রাকৃত বাহাদুর (!), কখনও বা প্রাকৃত পাগল হইয়া যান, 'যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব'—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের চরম-কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কাল-বিলম্ব করি, তবে অন্য বহির্ম্মুখ অসৎ লোক আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে। কখনও তাহারা বলিবে,—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্', কখনও তাহারা বলিবে,—'স্বদেশের-সেবা করাই পরম-ধর্ম্ম', কখনও বা তাহারা বলিবে,—'যে গ্রামে বাস করিতেছ সেই গ্রামের, সেই গ্রাম্য-দেবতার বা সমাজের মহত্ত্ব বিবর্দ্ধন করাই তোমার ধর্ম্ম।' এইরূপ নানা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাহাদের মনোহর বাক্য শুনিয়া আমরাও তখন বলিব,—'যখন ঈশ্বর আমাদিগকে কুকুর-দন্ত (canine teeth) প্রদান করিয়াছেন, যখন এত

পশু-পক্ষি-মৎস্যাদি জন্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিকে আমাদের খাদ্য ও শরীর-পুষ্টির উপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমরা ঐগুলি ভক্ষণ করিয়া আমাদের দেহের পুষ্টি ও আমাদের দেহের সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় লোকের দেহের পুষ্টি বিধান করিব ও করাইব এবং ঐ সকলকেই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিব।' তখন আমাদের বিচার হইবে, —'যেহেতু আমরা যুবক, সেহেতু আমরা যুবার ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিব; যেহেতু ঈশ্বর আমাদিগকে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু আমরা তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিব, আর আমাদেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালন-দ্বারা সুখ-সুবিধা-ভোগের জন্য—ঈশ্বরের হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, নাসিকা নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ', 'নির্ব্বিলাস', 'নিরঞ্জন' প্রভৃতি বলিব এবং যত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও সমগ্র বাহ্যজগতের বিষয়-সমূহ, সমস্তই আমাদের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে!—ইত্যাদি অপরাধময় বিচার জগতে প্রচার করিব।' তখন আমাদের নিত্য-মঙ্গলের পরিপন্থি-ব্যক্তিদিগকেই আমরা 'বন্ধু' বলিয়া বরণ করিব; কারণ, তাঁহারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল কথাগুলি বলিয়া আমাদিগের আপাত-মধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু এই-সকল বন্ধু কতদিন পর্য্যন্ত যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিবেন? তাঁহাদের কতদূর ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐসকল বন্ধুর স্বরূপ বিচার করিবার বা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না?

ভগবৎসেবা ছাড়িলে কখনও বিবর্ত্তবুদ্ধি, কখনও বা পাপ-পুণ্যে প্রবৃত্তি

যে-ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা আমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়সমষ্টিই কি 'আমি'? শ্রীভগবান্ থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে আমাদের

ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা কিন্তু নিত্যধর্ম্মের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান-কালে দেশ বা সমাজ-শাসন (civic administration) লইয়া ব্যস্ত! আমরা অনেকে ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি—অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিকেই 'ধার্ম্মিক' ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছি—অত্যন্ত বিষ্ণু-বিরোধী ও 'বৈষ্ণবাপরাধী' ব্যক্তিকেই 'পরম-বৈষ্ণব' বলিয়া কল্পনা করিতেছি, 'ভোগা-দেওয়া' কথাকেই 'ধর্ম্মোপদেশ' বলিয়া মনে করিয়াছি—পুণ্য ও পাপের অর্জ্জনের জন্যই নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি,—কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিবার চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি। (মুণ্ডকে ৩।৩)—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

শ্রুতি বলেন,—যখন ব্রহ্মযোনিকে অর্থাৎ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই হেমকান্তি পরমেশ্বর পুরুষোত্তমকে জীব দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হন এবং পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেন; তখন তিনি অঞ্জন অর্থাৎ মনোধর্ম্মের মলিনতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, হরিসেবায় নিযুক্ত বলিয়া পরমসাম্য বা শান্তি অবস্থা লাভ করেন; (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ)—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলই অশান্ত॥"

সকলকে নিরন্তর হরিভজনার্থ উপদেশ

মানুষ কি এতই মুর্খ যে, কৃষ্ণভজন ব্যতীত তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে,—এরূপ বিচার বা কল্পনা করিয়া পরমার্থপ্রদ দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে অকাতরে নষ্ট করিতে পারে! জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোনও কর্ত্তব্য নাই বা থাকিতে পারে না। এ-বিষয়ে আপনারা কি

একবারও বিবেচনা করেন না, একবারও ভাবিয়া দেখেন না, একবারও মনুষ্য-নামের সার্থকতা দেখাইতে পারেন না ? নিরন্তর হরিভজন করুন—সর্ব্বজীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন,—সকল জীবের চেতন-বৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। সকল জীবের, সকল অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র পরিপূর্ণ সার্থকতা। সমস্ত ইতর চেষ্টা পরিহার করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তিসমূহ নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। বহু বস্তু কখনও আমাদের পূজ্য হইতে পারে না। সর্ব্বপূজ্যতম বস্তুর প্রভায় ম্লান হইয়া অন্যান্য বস্তুসমূহের স্বতন্ত্রভাবে পূজ্যত্ব আর কল্পিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর পদই 'পরম' পদ ; তিনিই আমাদের একমাত্র সেবনীয় বস্তু।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বিদ্বৎসভা, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৩২, শ্রীরাধাষ্টমী তিথি

গোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধা

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি ॥"

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চাল-সঞ্চলন-স্পৃষ্ট অনিল ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-দুর্ল্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটী 'শ্রীরাধারসসুধা-নিধি'-গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের অনুগমনেই বৃষভানুকুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

গোবিন্দ-মোহিনী শ্রীরাধা

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা-প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিল রসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানব-জ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত

ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা-দ্বারা অপর-লোককে বুঝান যায় না।

অভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার মহিমা স্বয়ং কৃষ্ণেরই জ্ঞেয় ও প্রচার্য্য

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্‌ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব-সমষ্টির ভাষায় বুঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য-বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ

করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার পূর্ব্বে শ্রীমতীর মাধ্যাহ্নিক-সেবার কথা অজ্ঞাত ছিল

পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল অর্থাৎ আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভৃতিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যেরূপ সেবা-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রপঞ্চে তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক-লীলায় যাঁহাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ নৈশ-লীলা-কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়া-তটে নৈশ-বিহারের কথা—যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগগণ-কথিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-মধুরিমার উৎকর্ষের কথা তারতম্যবিচারে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময়-কল্পতরুতলে নবনবায়মান অপূর্ব্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক বা আচার্য্যই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা-মাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি-প্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে কাহারও সেই মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না। বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-কথিত 'দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-

পূজাদি-লীলৌ'-পদ-নির্দ্দিষ্ট লীলা-পরা-কাষ্ঠায় প্রবেশ-সৌভাগ্যের কথা মধুর-রস-সেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে ;—এ কথা নিম্বমানন্দ-সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই।

অপ্রাকৃত মধুর রস প্রাকৃত-রসাশ্রিতের অগম্য

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত-পদবী-সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত-নিজ-জন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোনক্রমেই জানিতে পারেন না। যে-দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছ নীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেইদিনই আপনারা এইসকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এইজন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচার-ভ্রম ও তন্নিরসন

একশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। সেই অক্ষজধারণাকারিগণ ভোগপরতা-ক্রমে বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজীবপাদ

'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি-গ্রন্থে তিনি বিচারপ্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীজীব-পাদ-কর্তৃক শ্রীরূপ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পারকীয়-বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা বা আরোপ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, ঘটনা তাহা নহে। আমরা দুই-তিন-শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাকৃত-সাহজিকগণের ঐতিহ্যে এইরূপ কুবিচার লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে সেই উদ্গার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ—শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের আচার্য্য; তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, সেইসকল জড়ান্ধ লোক যাহাতে মহা-অসুবিধার মধ্যে না পড়িতে পারে, তজ্জন্যই শ্রীজীবপাদ ঐরূপ সুসিদ্ধান্ত-বিচার দেখাইয়াছেন। যাঁহারা নীতির পরা-কাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর বৈরাগ্য ও বৃহদ্ব্রতধর্ম্মযাজনে পার-দর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহেন, সেইরূপ পরম-চমৎকারময়ী চিন্ময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারি-জনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও-কোনও-স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতি-মূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা কৃষ্ণ-ভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পূ-বর্ণিত রাধাগোবিন্দের বৈধ-বিবাহ—তাঁহাদের পারকীয়-ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। পারকীয়রসের পরম-শ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা মায়িক অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহা-দ্বারা প্রাকৃতবিচার-

পরিপূর্ণ-মস্তিষ্কযুক্তসহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা প্রাকৃত-জার-রতা ছিলেন; কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক;—বার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ),—

"যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে' অরুন্ধতী।"

রসের অথবা রতি ও সামগ্রীর বিচার

শ্রীকৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী; শ্রীমতীও সকল মহালক্ষ্মীর অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাভব, বৈভব ও পুরুষাদি অবতার-গণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাও লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপতি এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই তাঁহার নিত্যকাল পরিপূর্ণতম-সেবাধিকারিণী; সুতরাং তিনি নিত্যকান্তা-শিরোমণি ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়'; স্থায়ি-রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা—সেই ভগবত্তত্ত্বেরই 'আশ্রয়'। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ-প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি বা স্থায়িভাব—জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ। এই স্থায়িভাবস্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দরূপা হইয়াও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার—(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতু-রূপ বিভাব দুই-প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি—রতির বিষয়, অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি 'বিষয়'রূপ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয় এবং যিনি—রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্ত্তমান, তিনিই 'আশ্রয়'রূপ আলম্বন।

অপ্রাকৃত ধাম ও অখণ্ড কাল

বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই জড়-জগতে যেমন ভূত-কাল বা ভাবি-কালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয় না, মূল আকর-স্থানীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি ধামে তদ্রূপ নহে; তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে যুগপৎ —ভূত হইয়া থাকে।

বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে 'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদি-গণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি, 'কাব্যপ্রকাশ'-কার বা ভরত-মুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্ত-কোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্য-রসে সুবলাদি, দাস্য-রসে রক্তকাদি, এবং শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুন-সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

মধুরাদি রসের অধিকারি-নির্ণয়

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এইসকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগে'র আদর্শ দেখাইয়া এইসকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে-স্থানে ও যে-ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি শ্রীরাধার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূল-জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে-অপ্রাকৃতধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন। এই-সকল কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এইসকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী বার্ষভানবীর তত্ত্ব ও মহিমা

শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ-শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ-গোস্বামী—যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী—যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ

অংশিনী ; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—"কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশ-পাশ"। সহস্র-সহস্র গোপীর যূথেশ্বরীগণ, মূল অষ্টসখীর সহস্র-সহস্র পরিচারিকা-বৃন্দ বৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আটপ্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আট-দিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী—যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে-রসের রসিক, যে-রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা যাহা চা'ন, সেইসকল ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্ত-কাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা-রসে নিমগ্না।

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও গুণরাশি

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধচিন্ময়-ভাবে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান শ্রীনারায়ণে ষষ্টি গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজমান। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব্ব চারিটী গুণের নায়ক, তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বলোক-চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-বারিধি; তিনি—অসমোর্দ্ধরূপশোভা-বিশিষ্ট ; তিনি—ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-বাদনকারী ; তিনি—শৃঙ্গার-রসের অতুল প্রেম-দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলের সহিত বিরাজমান ; অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া(লীলা)-মাধুরী, শ্রীবিগ্রহ(রূপ)-মাধুরী, বেণুমাধুরী ও সেবক-মাধুরী—এই চারিটী অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজমান। এই চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্য্যন্ত নাই।

চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগতের পরস্পর ভেদ ও ধর্ম্মের বিচার

এই জড়-জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক; আর, অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে একমাত্র সেব্য-বস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকগণের নিত্য-চিন্ময় স্বার্থ। সেই চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতে বহু সেব্য ও বহু সেবক ছিল, আছে ও থাকিবে। এই জড়জগতে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ—পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলেই সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ এককথায়, এইস্থানে সেব্য ও সেবকের নিঃস্বার্থপরত্ব নাই এবং এইস্থানে সমস্তই এক-তাৎপর্য্যের অভাব বা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের অনিত্য স্বার্থের জন্য, এবং পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে—নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থাৎ পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ—এক নহে। এইস্থানে যত-বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে তাঁহারা আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা—হৈতুকী, অনৈকান্তিকী ও অব্যবসায়াত্মিকা। আত্মধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এই জড়-প্রপঞ্চের পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তন্মধ্যেও স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যেই পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ, সুতরাং শুদ্ধ-সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যে-স্থানে অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন একটীমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ বা বিষয়তত্ত্ব—যেস্থানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেস্থানে আর ব্যভিচার হইতে পারে না। সেস্থানে 'বিষয়' এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; শক্তি—

অনন্ত অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্ব-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব। শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"

শক্তির ও শক্তিমৎতত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার

অদ্বয়জ্ঞান শক্তিমৎ-তত্ত্ববস্তু 'এক' হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায়, শক্তিবিচারে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তিবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে আশ্রয়জাতীয়ত্ব-রহিত কেবলাদ্বৈতপর বিচার নাই।

আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় লাভের উপায়

এই দেবীধামে ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। সেই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের অধিশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার পরিকরগণের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ-রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্বসমূহের সহিত বিষয়তত্ত্বের কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। আলঙ্কারিকের পরিভাষা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'—দার্শনিক-ভাষায় 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্লভাদপি সুদুর্লভ' চরণাশ্রয়—বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই; 'রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত' 'অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা' 'মহাবদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরই এই গুহ্যতম কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন

গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শ্রীরাধা-সেবা-সম্বন্ধে সুষ্ঠু অভিজ্ঞানাভাব

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই ; কারণ, তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপাসনা-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ও মধ্য ৮ম পঃ)—

"পারকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি।
তাঁর মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥"

* * *

"গোপী-আনুগত্য বিনা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থে মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক-লীলার পরম-চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই ; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমতী বার্ষভানবী রাসক্রীড়া-কালে 'সাধারণী' বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্ব্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গলাভাশায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান-কার্য্যের দ্বারা, শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীমতী বার্ষভানবীর মুল আকর পর-শক্তিত্ব

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা ; তিনি—যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী ; তিনি—বিভিন্ন শক্তি-পরিচয়োত্থ ধর্ম্ম ও সংজ্ঞা-সমূহেরও আকর ; তিনি—স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পর-শক্তি'। 'শক্তিমদ্বস্তু' বলিতে যাহা বুঝায়, 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা ; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিতাশ্রিতের আশ্রয়েই পরম-মঙ্গল

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম-লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরমধন্য ! সেই বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের সুমহান্ আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরম-মঙ্গল হইবে। অতএব—

"দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥"

'অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পতরুর তলে রত্নমন্দিরস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবা-পরা শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয়-নর্ম্মসখীগণের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে আমি স্মরণ করিতেছি।'

শ্রীধর-স্বামিপাদ ও মায়াবাদ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—সন্ধ্যা, ভাদ্র, ১৩৩২

প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ;
আদি-বিষ্ণুস্বামী

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য-পাঠে ও অনুসন্ধানে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় যে বহু প্রাচীন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রথম-পর্য্যায়ে আমরা 'শ্রীদেবতনু' বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। প্রথম-পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে শ্রীনৃসিংহোপাসনা-প্রণালীর কথাই ঐতিহ্যে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন,—তৎকালে ভারতে বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে গোপালের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'কার সায়ন-মাধব রসেশ্বর দর্শনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামীর অতি-সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বিষ্ণুস্বামীকে নৃসিংহোপাসক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। 'বল্লভদিগ্বিজয়' ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য-গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামিগণ দশ-নামী ও অষ্টোত্তরশত-নামী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামী

দ্বিতীয়-পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে আমরা 'শ্রীরাজগোপাল' বিষ্ণু-স্বামীর নাম দেখিতে পাই। তিনি দ্বারকায় শ্রীরণছোড়জীউর বিগ্রহ স্থাপন করেন। বল্লভাচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তি-সময়ে আন্ধ্র-বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মধ্যযুগীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় ; শ্রীধরস্বামিপাদ

মধ্যবর্ত্তি-সময়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীধর-স্বামিপাদকে বাহিরের দিকে মর্য্যাদা-মার্গে নৃসিংহোপাসক বলিয়াই আমরা জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণোপাসনাও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রবল ছিল।

শ্রীধরস্বামিপাদ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও তন্নিরসন

কাহারও কাহারও মতে, শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন' শ্রীবল্লভাচার্যের মতও তাহাই। প্রায় সার্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে 'দীপিকা-দীপনে'র লেখক তৎকালে বৃন্দাবন-মথুরা-প্রভৃতি স্থানে বল্লভীয়-চিন্তা-স্রোতের প্রাবল্য ও সঙ্গ-ফলে শ্রীধরস্বামিপাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদী' মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নাভদাস-লিখিত 'ভক্তমাল' ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য এবং শ্রীধরের উক্তি ও বিচারসমূহ সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি উক্ত ধারণার বিপরীত ভাবই প্রমাণিত হয়।

শ্রীধর-স্বামিপাদ মায়াবাদী নহেন—প্রথম প্রমাণ

শ্রীধরস্বামিপাদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-মতে বস্তুর অংশ—জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া, বস্তুর কার্য্য—জগৎ ; তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই 'বস্তু'-শব্দবাচ্য। ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই চরণের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"বাস্তব-শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবো, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথক্।" এই বাক্যদ্বারা তিনি যে কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না,—ইহা বেশ বুঝা যায়।

নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদী কখনও জীবের বাস্তব-সত্তা, তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি ও বস্তুর কার্য্য স্বীকার করেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াকে অবস্তু, বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্মকে ত্রিবিধভেদহীন, জগৎকে অসত্য, জৈবজ্ঞানের বিবর্ত্ত-জন্য তাৎকালিকী অনুভূতির মিথ্যাত্বই বিচার করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকায় অন্য কোন আচার্য্যের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় "তদুক্তং বিষ্ণু-স্বামিনা—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥' তথা 'স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবিভূ্ত-পরানন্দঃ স্বাবিভূ্তসুখদুঃখভূঃ ॥ স্বাদৃগুত্থ-বিপর্য্যাস-ভবভেদজ-ভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ ॥'" এবং ৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় 'শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা' প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু-স্বামি-বাক্যের উল্লেখ-দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ যে শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অনুগত হ্লাদিনী-সংবিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ মায়াধীশ শ্রীনৃসিংহের উপাসক শুদ্ধা-দ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাই স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

তৃতীয় প্রমাণ

নাভদাসজীর 'শ্রীভক্তমাল'গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামীর পরমানন্দ-নামক একজন অধস্তন ছিলেন। পারম্পর্য্যক্রমে এই পরমানন্দই শ্রীধরস্বামিপাদের গুরু। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে "যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্" এই শ্লোকে ভগবদ-ভিন্ন গুরুদেবের বন্দনা করিয়াছেন।

চতুর্থ প্রমাণ

মায়াবাদিগণ পঞ্চোপাসনা অবলম্বন-পূর্ব্বক নৃপঞ্চাস্যের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম রুদ্রের উপাসনা স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রাপ্তিকেই 'সাধ্য' বলিয়া জানেন। কিন্তু শ্রীধরপাদের ভাগবতীয়-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ঐরূপ নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন না করিয়া শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়ভক্তরূপে পরমধাম, জগদ্ধাম, দশমতত্ত্ব আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীনারায়ণের বিলাসবিগ্রহ সদাশিবকে পরস্পর-আলিঙ্গিত-বিগ্রহরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

"মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ॥"

পঞ্চম প্রমাণ

উক্ত মঙ্গলাচরণের প্রথম-শ্লোকেও 'নৃসিংহমহং ভজে" এই বাক্য-দ্বারা শ্রীধরস্বামী যে নৃসিংহোপাসক ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ষষ্ঠ প্রমাণ

শ্রীধরের গুরুভ্রাতার নাম—শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামী। এই শ্রীলক্ষ্মীধর—'শ্রীনাম-কৌমুদী' নামক গ্রন্থের লেখক। শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব-সম্বন্ধে অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐসমস্ত শ্লোক আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীধরস্বামিপাদ কিছুতেই নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতে পারেন না; কারণ, নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদিগণ কখনও শ্রীভগবানের এবং তদীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অভেদ, চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না

সায়নমাধবের 'রসেশ্বরদর্শন'-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য অভিন্ন নামরূপাদি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ যে বিষ্ণুস্বামি-মতাবলম্বী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবযতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সপ্তম প্রমাণ

শ্রীধরস্বামিপাদ যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টজীকে শাসন করিয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া স্বীকার এবং শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আচার্য্য ও জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিতেন না। শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী হইলে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদও তাঁহাকে "ভক্ত্যেকরক্ষক" বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজীব প্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদিগণকে 'ভক্তির রক্ষাকারী' বলিবার পরিবর্ত্তে "ভক্তির সর্ব্বনাশকারী" বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যে-কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—৫ই আশ্বিন, ১৩৩২

শ্রীচৈতন্যের দয়া-মহিমা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র—পরমপরিপূর্ণ-চেতনময় বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজন না করিবেন—তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান মানব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করায় বহু বাহ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, নিরন্তর চৈতন্যচরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণেই চেতনময়ী সেবার উন্মেষ

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যাঁহার কর্ণে যে-পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই-পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় প্রলুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণচেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল-কলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু ; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে তাঁহার পাদপদ্মে ষোল-আনা আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন।

যতদিন-পর্য্যন্ত না মানবগণ দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র ও কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বদ্বারা নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিরন্তর সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যের কথা ষোল-আনা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে। (ভাঃ ২।৭।৪২)—

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

শ্রীনিত্যানন্দপদাশ্রয়েই গৌরকৃপা-লাভ

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমলাশ্রয় ব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-লাভ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রয়-লাভ হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূরীভূত হয়; তখন জীব আর 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া বহুমানন করেন না।

"নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর' নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু—বড় দুরাচার।
'নিতাই' না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি'

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি॥
নিতাই-চরণ—সত্য, তাঁহার সেবক—নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর' আশ।
এ অধম—বড় দুঃখী, নিতাই! মোরে কর' সুখী,
রাখ' রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

আচার্য্যত্রয় ও পরবর্ত্তিকালের ধর্ম্মজগৎ

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদিবহির্ম্মুখ সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক, ধর্ম্মের নামে সমাজে কলঙ্ক ও ভক্তির বা বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণাদি কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। গত তিন-শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস—ঘোর তমসাচ্ছন্ন; তন্মধ্যে কেবল দুই-একটী ভজনানন্দী পুরুষ নিজে-নিজে ভজন কদাচিৎ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা করিবার উপযুক্ত খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

নিজগুরু-বর্গের মহিমা

আমরা মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে যে-সকল বিশুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইপ্রকার মহদ্ব্যক্তিগণের দর্শন বোধ হয় আমাদের ভাগ্যে আর ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের

ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন;—তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজন ও হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

কৃষ্ণনাম ও গৌর-নিতাইর দয়া

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটি-জন্ম ধরিয়া কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেম দান করিবে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই;—অনর্থযুক্তাবস্থায়ও মানব যদি নিষ্কপট-ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌরনিত্যানন্দের নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ অতি-শীঘ্রই দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ—আমার উদরভরণ বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের অথবা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া জড়েন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু'—এইরূপ জ্ঞান বা কল্পনা লইয়া আমরা মুখে 'গৌর গৌর' করি, তাহা হইলে আমাদের 'গৌরনাম' কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ 'মায়ার নাম'-কীর্ত্তন হইবে মাত্র। গৌরনাম কীর্ত্তিত হইলেই নিরন্তর নাম লইতে লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। শিয়ালদহ হইতে হাওড়া—দুই মাইল পশ্চিমে; কেহ যদি শিয়ালদহের দুই-মাইল পূর্ব্বদিকে আসিয়া বলেন,—'যখন আমি শিয়ালদহ হইতে

দুই-মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি' ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার থাকিলেও তাহার স্ব-কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি পশ্চিমোত্তরগামী ট্রেণ ধরিতে পারিবে না ; সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থলে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,—বরিশাল-জিলায় এক ডাকাতের দল এক-সময়ে 'প্রাণগৌরনিত্যানন্দ, প্রাণ-গৌরনিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌর-নিত্যানন্দনামাক্ষর কিছু 'গৌর-নিত্যানন্দের নাম' নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদাশ্রিতগণের তত্ত্ব ও সেবা-বিচার

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি-সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর—ত্রিকালসত্য বস্তু। অক্ষজ-দর্শনকারী যে-প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন এক-সময় প্রকট এবং কিছুকাল পরে অ-প্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জীব-সামান্য-দৃষ্টিতে 'মহাপুরুষ' বা 'কিছুকালের জন্য উদিত একটী ধর্ম্মপ্রচারক মানবমাত্র' মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'দান' ও নিত্যচরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন ; তিনি—ত্রিকালসত্য-বাস্তব-বস্তু। তিনি—শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দ-বর্দ্ধক ; শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র—পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি—[

পরতত্ত্ব ; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। বৎসল-রসে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গ ও—গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পর-তত্ত্বেরই সেবক ; (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ)—

"কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্য-ভাব ॥"
"পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥"

গৌরসুন্দরের ভৃত্য-তত্ত্ব

সেই গৌরসুন্দর—নিজ-ভৃত্য-বর্গের সহিত, নিজপাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তিনি—নিত্য-বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং পাল্যবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দে তাঁহার দাস্যরসাশ্রিত সেবকগণকে বুঝাইতেছে।

গৌরসুন্দরের পুত্র-তত্ত্ব

যাঁহারা গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবা-দ্বারা তাঁহার পাল্যবর্গের মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা—তাঁহার 'পুত্র'। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই বাক্যানুসারে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতৃস্বরূপে তাঁহাদের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীনামাশ্রিত লব্ধপ্রেম ভক্তগণই তাঁহার 'পুত্র'—ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-বংশ। ভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশ্যগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর, যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি-বশতঃ চ্যুত-গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈত-কুলের কণ্টক-বৃক্ষ হইয়া জগতের মহা-অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা, 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিতে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র; শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমন্ত জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব পিতা-পুত্রের কৃত্য-ভেদ

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র'-নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর-কার্য্যে ব্যস্ত, সে—'পুত্র'-নামের কলঙ্ক এবং পিতা সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে কখনও উদ্ধার লাভ করিবেন না; তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপ-কার্য্য-মাত্র হইয়া পড়ে। আর, যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী—হরিভজনেরই অনুকূল ও অন্তর্গত। বৈষ্ণব-পুত্রে ও অবৈষ্ণব-পুত্রে এবং বৈষ্ণব-পিতায় ও অবৈষ্ণব-পিতায় এই ভেদ।

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্ব এবং গৌরনাগরী-মতবাদ-নিরসন

শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন; অতএব বৈধ-স্বকীয়-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী—তাঁহার কলত্র, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ভজনবিচারে শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণই তাঁহার মধুর-রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। আবার, শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী—প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। মনোধর্ম্মী শাক্তেয়বাদী কতিপয় ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে নিজদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার

চেষ্টায় 'গৌরনাগরী'রূপ পাষণ্ড-মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল-মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজনপ্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হওয়ায় এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলাই ন্যায়-সঙ্গত।

ছয়রূপে গৌরসুন্দরের চিদ্‌বিলাস

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভুও তদ্রূপ প্রভুর সন্ন্যাসলীলা—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধিই অভক্তি

কেহ কেহ মনে করেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন কেবলমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সিদ্ধিলাভ ঘটে, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। অক্ষজজ্ঞানী সেবা-হীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি হইতেই এইরূপ কুবিচার উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া, 'গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই' প্রভৃতি যে সমস্ত প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে; তাহা কপটতা ও গৌর-ভোগ-চেষ্টা-মাত্র।

আচার্য্য গোস্বামিগণের আচরিত মত

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ-পোষণ—জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে পাষণ্ডিতা ব্যতীত

আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; রাগমার্গের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন—'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে, স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ'—হে মনঃ, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর।' এ-স্থলে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে নন্দনন্দনস্বরূপে অজস্র স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দ-দয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না।

আচার্য্য-গোস্বামি-মত-বিরুদ্ধ শাক্তেয়মতবাদ

কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা অপ্রাকৃত হরিলীলাকে মায়ান্তর্গত-জ্ঞানে অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধি-মূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা সম্ভোগবাদি-ভোগী; তাঁহারা—গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক—বিকৃতমস্তিক, কতকগুলি লোক—প্রবঞ্চক, আর কতকগুলি লোক—ভজনহীন নির্ব্বোধ, সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত দলের অনুগত। প্রাগুক্ত শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ বিপ্রলম্ভাবতারি-শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং শ্রীরূপানুগ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগ-তৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর-নাম-মন্ত্রের বিরোধ করিয়া ত্রিগুণচালিত হইয়া জড়াহঙ্কার-বশে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় গৌর-সুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে

গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক-ভোগ্যবস্তুমাত্র জ্ঞান করিয়া ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট ;—উভয়েই গৌর-কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব ও লীলা-বৈচিত্র্যের বিরোধী।

গৌরসুন্দরের ঔদার্য্য লীলা বৈশিষ্ট্য

অনর্থময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থার উপাস্যও শ্রীকৃষ্ণই। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই শ্রীগৌরোপাসনা ; আর, সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু-দ্বারা অঘ-বক-পুতনার ন্যায়, অকালে তাহার বধ সাধন করিয়া থাকেন ; কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণা' রাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন।

কর্ত্তাভজাদের কুমতবাদ

আবার, আর একসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা 'গৌরভজা' হইবার পরিবর্ত্তে 'গুরুভজা' বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই স্বয়ং কৃষ্ণ ; সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এইসকল স্বতন্ত্র-জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রমত্ত 'জরদ্গব'তুল্য গুরুব্রুবকে 'কৃষ্ণ'(?) সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ-ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন. শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐসকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল-ভাষায় বলিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ও মধ্য ২৩ অঃ)—

"মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥

উদরভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন
আপনারে গাওয়ায় বলি' 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার;
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার?"

* * *

"উদরভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
বোলায় 'ঈশ্বর', মূলে জরদ্গব!
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ' ভাব' গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য—দেহ, ইহারে লইয়া।
বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥"

কর্ত্তাভজাগণের গতি

এইসকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে 'তদীয়া তুলসী' (?) পর্য্যন্ত সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডিতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করে। এই-সকল পাষণ্ডীর কথা বহু লোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরকগমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোন ভাল উপদেশ বা পরামর্শ কিম্বা কোন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না! ইহাদের দ্বারা এই যে ত্রিগুণা-দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা সাধিত হইতেছে, তাহাতে এইসকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ইহাদের বিষ্ণুতে ভোগপরা বিরোধিতা আরোপিত হইবে না। এই গুরুভজা-মত

জগতে বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকগুলিই এইসকল মতের আদর করে।

আচার্য্য-গোস্বামি-মহাজন-প্রদর্শিত ভজন-প্রণালী

শ্রীগোস্বামি-পাদগণ ও শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে গৌরাঙ্গ এবং শেষে গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর ভজন কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়প্রমত্ত 'গুরুভজা'-গণের 'গুরুই গৌরাঙ্গ'—এরূপ পাষণ্ডি-মত বাদ প্রচার করেন নাই; গুরুভজনের ছলনা দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই; আবার 'গৌরভজা' হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনের ছলনা দেখাইয়া শ্রীগৌরানুগত্য ত্যাগ করেন নাই। (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)—

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম-মঙ্গল॥
যাঁ'র প্রাণ-ধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥"

শ্রীগুরুদেব—গৌরাভিন্নবিগ্রহ; তিনি—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব প্রকাশবিগ্রহ; তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা—নির্ব্বিশেষ-বাদীর অপরাধময়ী চেষ্টা-মাত্র। উহাই 'মায়া-বাদ' বা 'পাষণ্ডিতা'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অন্যত্র আরও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)—

'তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥'

তিনি সদ্‌গুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন ' শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বহুস্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর' নিতাইর পায় '
'নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর' নিতাইর চরণ দু'খানি।'
'শ্রীগুরে করুণা-সিন্ধো লোকনাথ দীনবন্ধো
মুই দীনে কর' অবধান।'
'নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, 'গিরিধারী' যাঁর নাম,
সখী-সঙ্গে তাঁরে ভজ' রঙ্গে।'
'প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি'।
শ্রীগুরুপ্রসাদে, ভাই, এ-সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব, রতি-মতি-ভাবে সেব',
প্রেমকল্পতরু-দাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এইসব কথা ॥"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুদেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণ ভজন শিক্ষা দেন শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের

আরাধনা-তৎপর বলিয়া তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মধুর-রতিতে রাধা-প্রিয়-সখী। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজনপ্রণালী এই শ্লোকটীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে শ্রীআনন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ-প্রমুখ পরম ও পরম-পরাৎপর গুরুবর্গের ভজন,তৎপরে চতুর্যুগে উদ্ভূত ভাগবত-বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণভজনপ্রদানের মালিক শ্রীরূপ-প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীবপ্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈতপ্রভুর ও নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সাবরণ পরমেশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই 'কৃষ্ণ জানাইয়া সবে বিশ্ব কৈলা ধন্য।" তিনি অনর্পিত-চর উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভার প্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ),—

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—'যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' তিনি—স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম—কৃষ্ণচৈতন্য ; তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ ; তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে ; উহা—নিত্য। কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী লীলা ও গৌরের বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা, এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈচিত্র্য-

বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈচিত্র্যের বিলোপ সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর—কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—গৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়বিগ্রহ। গৌর-সুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাহাই বলিয়াছেন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

শ্রীচৈতন্যের দয়া

স্থান—শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ভবন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।

সময়—অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩২

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—'সর্ব্বদাতৃগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা প্রকট করেন, যিনি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুতে সর্ব্বোত্তম দানশীলতা আছে এবং তিনি—প্রেমময় বিগ্রহ।

জড় শব্দ-নাম ও বৈকুণ্ঠ শব্দ-নামের ভেদ

জড় শাব্দিক মহোদয়গণ বিচার করেন যে, 'কৃষ্ণ' শব্দটী বুঝি অন্যান্য শব্দেরই ন্যায় একটী আভিধানিক শব্দবিশেষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদের ঐপ্রকার অক্ষজধারণার অতীত অধোক্ষজ বস্তু। যে-কোনও বস্তুবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, নাম, রূপ গুণ ও ক্রিয়াই একমাত্র সহায়। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নিরর্থকতা দূরীভূত হইয়া সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জাগতিক বস্তুসমূহের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—নশ্বর ও পরস্পর ভিন্ন এবং পরস্পরের মধ্যে মায়িক ব্যবধান বর্ত্তমান। জগতে 'বৃক্ষ'-শব্দটী, বৃক্ষের রূপটী, বৃক্ষের গুণটী বা বৃক্ষের ক্রিয়াটী কিছু সেই সাক্ষাৎ বৃক্ষ-বস্তুটী নহে। 'বৃক্ষ' এই নামটী হইতে বৃক্ষের স্বরূপ বা বৃক্ষের বস্তুত্ব পৃথক্। 'বৃক্ষ' এই নামটী উচ্চারণ করিলে

কিছু বৃক্ষের বস্তুত্ব বা ফল উপলব্ধি বা উপভোগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু, 'কৃষ্ণ' এই নামটীতে, কৃষ্ণস্বরূপ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহের কোনই। ভেদ নাই। 'কৃষ্ণ' এই নামটীর কীর্ত্তনের দ্বারা (নামাপরাধ বা নামাভাস-দ্বারা নহে) সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপটী—কৃষ্ণের চিদ্বিলাসময় বিগ্রহটী উপলব্ধ হয়। সুতরাং, কৃষ্ণই একমাত্র 'পরম অর্থ' অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-যুক্ত নিত্য বাস্তব-বস্তু ; তিনি—আত্মার চিন্তনীয় ব্যাপার, আত্মার চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন-যোগ্য বস্তু, কর্ণদ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকা-দ্বারা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্যবস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু।

কৃষ্ণ ও মায়া, অথবা অধোক্ষজ ও অক্ষজ-জ্ঞান

কিন্তু ঐ কৃষ্ণবস্তু কাহাদের এবং কোন্ ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য বস্তু ? তিনি কখনও প্রাকৃত জীবের বা মায়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। যাহা-দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহারই নাম—মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কোনদিনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। ভগবান্ হৃষীকেশকে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ-যুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা—আমরা বর্ত্তমান-কালে যে চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা কাদা, মাটী, জল, কলিকাতার সহর, স্ত্রী, পুরুষ, পুত্র-পরিবার শত্রু ও মিত্রকে ভোগ করি, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নয়। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত-জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রূপ-সেবাভিলাষপর অক্ষির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

গৌরের ঔদার্য্যলীলা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ-বিলাস-বিগ্রহসকল, চতুর্ব্যূহ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, কেহ বা কৃষ্ণের 'অংশ', কেহ বা 'কলা'; শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ আংশিক ভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধারণা হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা—সেই কৃষ্ণ-বস্তুরই। তাঁহারই বিকৃতপ্রতিফলন আমরা এই জড়জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর-বকাসুরাদির বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য-লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; কিন্তু অভিন্ন-নন্দনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্য-লীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ডী অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপা-পূর্ব্বক চরম-মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য উদ্যত,—একটু-আধটু মঙ্গল নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে মহা-দান করিতে উদ্যত, তাহার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের হস্তামলক (করতলগত) রূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতে পারেন। সেই মহা-বদান্য গৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতা অর্থাৎ তাঁহার অনর্পিতচর মহা-দান সমগ্র জগতে প্রদত্ত হউক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র জগৎকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু বহির্ম্মুখ জগৎ জ্ঞান-বোধে অজ্ঞান-অবিদ্যার, আলোক-বোধে অন্ধকারের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

বৌদ্ধমত-বিচার

কেহ বা বলিতেছেন,—'আমি বৌদ্ধ'। 'বুদ্ধ' অর্থে জাগ্রত; বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর,—'তোমার চেতনের কি জাগরণ হইয়াছে? চেতনের বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুটাবস্থাই কি তোমার মতে অচিৎপরিণতির জন্য পিপাসা?' বৌদ্ধ বলিবেন,—'বুদ্ধদেব অচিৎ হইয়া যাওয়ার বা পরিনির্ব্বাণাবস্থা লাভ করিবার জন্য জীবকে পরামর্শ দিয়াছেন।' কিন্তু শ্রীজয়দেব তাহা বলেন না,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

বুদ্ধদেব অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া কি অতটুকু ক্ষুদ্র? চৈতন্যদেব জীবকে কোন্ হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সুধী ব্যক্তিগণ কি একবার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন? বৌদ্ধগণ জানেন যে, বুদ্ধদেব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে রক্ষা বা নাশ করিবার কথা বলিয়াছেন; কই, আত্মবৃত্তিকে রক্ষা করিবার কথা ত' বলেন নাই? বুদ্ধদেবে যে দয়ার কথা আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে অনন্ত, কোটিগুণে অনন্ত-প্রবাহে তাহা অপেক্ষা কত অধিক দয়া-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে!—বিচার করুন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বুদ্ধদেবের অহিংসা

শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া দয়া কেবলমাত্র অবিদ্যা-প্রতীতি বা বাহ্য-জগতের চিন্তা-স্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিলাস ও খণ্ড পরমাত্মানুশীলন হইতে যিনি জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিতে

পারেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ মহাবদান্য। জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের যে মহানুগ্রহ, তাহার তুলনা হয় না। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন; তাঁহারা হয় ত' বলিবেন,—বুদ্ধদেব বিষ্ণুরই অবতার; কিন্তু তাঁহারা জানেন কি—শ্রীচৈতন্যদেব অবতারেরও অবতারী? শ্রীচৈতন্যদেবের অহিংসা-ধর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র আংশিকভাব-মাত্র প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধদেব—তাঁহারই একজন 'নৈমিত্তিক'-শক্ত্যাবেশাবতার; আর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—নিত্য অবতারী। ঐরূপ অহিংসা-ধর্ম্ম ত' কোটি-কোটি-গুণে শ্রীচৈতন্যের অতুল পাদপদ্মে আবদ্ধ! তাই শ্রীচৈতন্যানুগতগণ শ্রীবুদ্ধদেবকে কখনও অমর্য্যাদা করেন না। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধ বা মায়া-বিমোহিত ব্যক্তিগণের কোনও কথা শ্রবণ করেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথারই অন্তর্ভুক্ত—জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট ও উত্তম শ্রেয়ঃকথা। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্ববৃত্তি-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুগত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও গৃহব্রত-ধর্ম্ম

গৃহব্রতধর্ম্ম আর কিছুই নহে, উহা—চৈতন্যবিমুখতা বা আত্মস্বরূপের উপলব্ধির অভাব। চেতনধর্ম্মের বিকৃতি সাধিত হইলেই নিজের ধর্ম্ম নিজে বুঝা যায় না। জীব—কাষ্ণ, তদ্ব্যতীত জীবের অন্যরূপ অভিমান—বিরূপেরই অভিমান-মাত্র; তাদৃশ অন্যরূপ ইতরাভিমানে আবদ্ধ হইয়া আমাদের 'চৈতন্যের অনুগত' বলিয়া পরিচয় দেওয়া—ধৃষ্টতা মাত্র কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ডধৃক্ ত্রিদণ্ডিগণই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা করেন।

বিষ্ণুতত্ত্ব-বিচার

সুরিগণকে অপর-ভাষায় 'বৈষ্ণব' বলা হয়. যদি আমরা চক্ষু প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলব্ধ-চক্ষু মেলিয়া তত্ত্ববস্তু দর্শন করি, তাহা হইলে

বিষ্ণুকেই পরমতত্ত্ব বা 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উপলব্ধি হইবে। বিষ্ণুই মূল-দেবতা; তাঁহা হইতেই অন্যান্য দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—বেদকথিত 'ভগ'-শব্দ হইতেই 'ভগবান্'-শব্দটী উদ্ভূত। উক্ত 'ভগ'-শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'সূর্য্য' বলেন। কিন্তু সর্ব্বদেবতার অন্তর্যামি-সূত্রে পরমতত্ত্ব বিষ্ণুই বিরাজমান; কেবল তাহাই নহে, সমস্ত বস্তুরই একমাত্র মালিক—বিষ্ণু। তিনিই একমাত্র পালক; সমগ্র জগৎ বা সমস্ত বস্তু—বিষ্ণুরই পাল্য।

চিদচিজ্জগৎ ও বৈষ্ণবের ব্যবহার

শাক্যসিংহ যখন সেই বিষ্ণুর অবতার, তখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তাঁহাকে অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবগণ কোনও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কাহাকেও অনাদর, অসম্মান বা কাহারও প্রতি হিংসা বা পূজা বিধান করেন না। বৈষ্ণবগণই একমাত্র অহিংসা-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক। আর, যাহাদের বৈষ্ণবতার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা যতই নৈতিক-চরিত্রবান, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি নামে জগতে পরিচিত থাকুন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে বহু-বহু-জীবের হিংসা করিতেছেন,—নিজকে নিজে হিংসা করিতেছেন! বৈষ্ণবগণ—সমদর্শী। পরতত্ত্বের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ইতর প্রতীতি লইয়া অপরাপর অধীনতত্ত্বের পূজা হয় না। পরতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া কুক্কুর, অশ্ব, চণ্ডাল, বা ভূতপূজা—কর্ম্ম-মার্গ বা পৌত্তলিকতা-মাত্র। অচ্যুতের উপাসনাতেই অন্যান্য চ্যুত বা বিভিন্নাংশ বস্তুসমূহের পূজা হইয়া যায় (ভাঃ ৪।৩১।১৪)—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥"

অন্য-প্রতীতিযুক্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র ভূতানুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণিগণের পূজা করিলে উহা-দ্বারা বিষ্ণুপূজা বাধা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ কার্য্য—অবৈধ; (গীতা ৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

গৌরভক্তের সত্যপ্রিয়তা ও দয়া

বৈষ্ণবের কোনও মতবাদের সহিত বিরোধ নাই, কেবল সঙ্কীর্ণ-মতবাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিত্য-মঙ্গলের জন্যই বাস্তব-বস্তুর যথার্থ স্বরূপটী তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাভিনয়-দ্বারা প্রভুর জীবকুলকে শিক্ষা-দান

শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে স্বগৃহে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বহু গৃহব্রত লোককে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য। আবার, তিনি যে গৃহস্থাশ্রমত্যাগ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাও অচৈতন্য জীবদিগকে চৈতন্য দিবার জন্য। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নবদ্বীপবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের শ্রীগৌরসুন্দরকে বাধা দিবার প্রচেষ্টা ও দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মাতাকে ও পত্নীকে বলিয়া গেলেন,—'কৃষ্ণকেই পুত্র ও পতি বলিয়া জ্ঞান কর।' পুত্রশোক-কাতরা পতিশোক-কাতরা জননীকে ও নিরাশ্রয়া প্রাপ্তবয়স্কা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দীনপতিত জীবগণের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য চলিলেন—যে সকল মন্ত্র পড়িয়া তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইসমস্ত জাগতিক কর্ত্তব্য-ভার পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য চলিলেন।' অচৈতন্য মানবজাতিকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্যই তিনি ঐরূপ অলৌকিক চেষ্টা দেখাইলেন।

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগে ও বুদ্ধের গৃহত্যাগে ভেদ

বৌদ্ধের কথা-মত শাক্যসিংহ যেরূপ নির্ব্বাণ-লাভেচ্ছা-রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সংসারত্যাগ-লীলা সেরূপ নহে। সমগ্র জীবজাতির নিত্য অভাব মোচন করিয়া নিত্যসম্পত্তি দিবার জন্যই তিনি বনে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তিনি—সমগ্র-নারীজাতির একমাত্র স্বামী, পিতৃমাতৃ-অনুভূতিযুক্ত ব্যক্তিগণের একমাত্র পুত্র, সমগ্র সখ্য ও দাস্য-ভাবাশ্রিতগণের একমাত্র বন্ধু ও প্রভু। শ্রীচৈতন্যের মহা-দান কেবলমাত্র বাঙ্গালা-দেশে আবদ্ধ থাকিবে,—এইরূপ নহে বা শ্রীচৈতন্যের মহা-দান কেবল ব্রাহ্মণ-কুলজাত ব্যক্তির প্রাপ্য,—এইরূপ নহে। সমগ্র জগৎ, সকল বর্ণ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, সধর্ম্মী, বিধর্ম্মী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তত্তৎ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচর দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব খণ্ড বা সঙ্কীর্ণ নহেন,—তিনি মহা-বদান্য—তিনি পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দময় পরম পরতত্ত্ব বিগ্রহ। অচৈতন্য-জীবদ্দশারূপ দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার জন্য তিনি—নিত্য পূর্ণচেতনময়,—অচৈতন্য জীবকুলকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য তিনি জগতে অবতীর্ণ। অতএব (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০)—

"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

গৌর-করুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন

স্থান—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবন, শিমূলা, কলিকাতা

সময়—সন্ধ্যা, রবিবার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ ॥"

আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা

আমাদের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন। তিনি—সাক্ষাদ্‌-ভগবান্ শ্রীহরি। তিনি পূর্ব্বে জগতে অন্যান্য অবতারে যে-সকল দান করিয়াছেন, সে-সকল দান হইতেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পূর্ব্বে যাহা কখনও দেওয়া হয় নাই—এইরূপ অপূর্ব্ব দান জগতে প্রদান করিতে বসিয়াছেন. শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বচনটী প্রদান করিয়াছেন তিনি—জগদ্‌গুরু আচার্য্য; তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটী 'বঃ'শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুগত-দাসানুদাসসূত্রে সেই বাক্যটী 'নঃ'শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। যাহা মানুষ জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই; পরন্তু যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীগৌরহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের প্রতি পরম-করুণা-পরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট শ্রীহরির কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের প্রকার-ভেদ অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা-প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ কতরকমে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে যে-স্থানে অবস্থিত—যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপভাবে উন্মেষিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই সে সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর যেভাবে যে-প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তররাজি সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

অনর্পিতচরী স্বভক্তি-শোভার বিতরণকারী শ্রীগৌরসুন্দর

ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাদৃশ দান করিয়া এই যুগে ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তিনি এই যুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান করিয়াছেন; তাহাই—'স্বভক্তি-শ্রী'। 'স্ব'শব্দের দ্বারা 'আত্মাকে' বুঝায়; সেই আত্ম-প্রতীতিগত সেবার শোভা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চরসাশ্রিত শুদ্ধ আত্মার সেবার প্রকার-ভেদ জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরু-তপ্তহৃদয়ে—আমাদের ন্যায় গুণজাত অবস্থায় পতিত কাঙ্গাল জীবগণকে সুদুষ্প্রাপ্যা 'অনর্পিতচরী' স্বীয় উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভা প্রদান করিবার জন্য—জগতের সকল জীবকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। আবার তিনি একটী সামান্য পরিমিত-সম্পত্তি-

বিশিষ্ট পুরুষও নহেন,—তিনি একটী সামান্য-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা-মাত্রও নহেন! দাতা স্বয়ং হরি! মানুষ মনে করেন,—এই ব্যক্ত জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু, কিন্তু সকল-কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবান্‌ই এই অপূর্ব্ব দানের দাতা। তাঁহাতেই সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত

জড়জগতের নাম-রূপ-গুণাদির বিচার

জগতের লোকসকল আনন্দ দ্বারা আকৃষ্ট ; কেহই নিরানন্দ চা'ন না। আনন্দ আবার বস্তুর নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়ায় অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকালস্থায়ি নহে ; তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের বিকৃত প্রতিফলনসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া—জগতের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া—বুদ্ধিমান্ পুরুষ পার্থিব নাম-রূপ-গুণাদিতে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায় ; কেননা, উহা সীমা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার যতটুকু প্রাপ্য, জীব এইস্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে ; ফলে, তাহার যোগ্য প্রাপ্যটীও হারাইয়া ফেলে।

পরমেশ্বর গৌরহরির তত্ত্ব

যে মূলবস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বশ্য বা ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে, তিনিই 'ঈশ্বর' বস্তু ; আমরা ইহজগতে যে-সকল

বস্তু বলিয়া উপভোগ্য বোধ করিতেছি, সেইসকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুদ্‌গ্রীব, তিনিই শ্রীভগবান্। যাঁহার আংশিক প্রকাশ—জৈব-জ্ঞানের উপভোগ্য 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত, সেই ব্রহ্ম—পরাৎপর মূল-পুরুষ শ্রীভগবানের দ্যুতিমালায় প্রকাশিত। এই পরতত্ত্বই সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব।

ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির অতীত চিদ্‌বিলাস-রসের বিচার

আমরা কাল্পনিক শ্রীগৌরহরির কথা বলিতেছি না; ব্রহ্মজ্ঞগণ পূর্ণব্রহ্ম হরির যে অসম্যক্‌স্ফূর্ত্তি, যোগিগণ যে আংশিকবৈভব বা ব্যাপক ভূমার কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই বস্তুর কথাও বলিতেছি না; যাঁহারা উজ্জ্বল-রসের বিরসাবস্থাবিশেষে—জড়জগতের প্রাকৃত রসে বিরাগবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্যক্তিগণের জ্ঞানগম্য অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীতির কথাও বলিতেছি না; 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনুভূতি বা ইহজগতের খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দ্দশভুবনের কথা বা উন্নত সপ্ত-ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক; কিন্তু যাঁহার আংশিক বিকৃত প্রতি-ফলিত রস আমরা ইহজগতের স্ত্রী-পুরুষে, পিতা-পুত্রে, বন্ধুতে-বন্ধুতে প্রভু-ভৃত্যে বা নিরপেক্ষাবস্থায় লক্ষ্য করি, সেই বিকৃতরসগুলি যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর কথাও আমরা বলিতেছি না। এই অতন্নিরসনরূপ কার্য্যটীতে তাঁহাদের সহিত আমাদের বাহিরের দিকে কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে এমন একটী রসের কথা বলিয়াছেন,—যিনি কেবলমাত্র রস-রাহিত্যরূপে বর্ণিত হন না, পরন্তু যাঁহার একটা নিত্য পরম-চমৎ-কারিতা-যুক্ত নিত্যপরিপূর্ণরসময় বাস্তব-স্বরূপ আছে,—যে জিনিষটী পরিপূর্ণরসময়, যাঁহার পূর্ণপ্রাকট্য আছে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামি-

প্রভুকে সেই বাস্তব-সত্য নিত্যচিন্ময়রসের কথা বলিয়াছিলেন (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ)—

"ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারভারের ভূমিকায় সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে 'রস' উপলব্ধ হয়। জাগতিক গৌণী বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণ রস লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যখন আত্মধর্ম্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তখন তাহাকে 'রস' বলে। উহা নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান্, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা পশু-পক্ষীর পরস্পর হেয় কাম-রস নহে। আত্মা যখন নিজস্বভাব প্রাপ্ত হন, তখনই আত্মবৃত্তি-দ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইতে থাকে। 'আমিত্বে'র অনুভূতিতে যখন 'ইট-পাট্কেল্' বা কোন্ গুণজাত বস্তু 'ধাক্কা' দেয় না, তখনই ঐ রস আস্বাদিত হয়।

জড়-রসের কারণ-বিচার ও নীরস ব্রহ্মবাদ-নিরসন

এই জড় প্রপঞ্চে পঞ্চবিধ বিকৃত-রস বর্ত্তমান; আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি,—এই অনুভূতিটী থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া যায়! কিন্তু জগতে এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি (তৈঃ ভৃঃ ১ অনু) বলেন,—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম।' ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু—পূর্ণবস্তু হইতেই এই আংশিক বিচিত্রতা এই খণ্ড-জগতে বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবস্তু—নিত্য নব-নব-ভাবে রস-বিলাস-ময়। আমি যদি 'ঘোড়দৌড়' দেখিতে গিয়া একটী গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটী জানালা দিয়া ঘোড়-সোয়ারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে, ঐ অশ্ব পূর্ব্বে দৌড়াইতে ছিল না, পরেও

দৌড়াইবে না এবং ঐ ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট অশ্বারোহীও আমার দর্শনের পূর্ব্বে বা পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচারে যেমন ভুল হয় ;—কেন না, আমার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বারোহী দৌড়াইতেছে এবং পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে,—কেবল আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ-নিবন্ধন অর্থাৎ প্রতিঘাত-যোগ্যতা থাকায় বা অসম্পূর্ণ যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করিতে যাওয়ায় উহা যথার্থভাবে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণা বা বিচার যেমন আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও সম্যক্‌দর্শনের অভাব-দ্যোতক ;—তদ্রূপ, যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞান-দ্বারা বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা থামিয়া যায়, তাঁহারাও ভ্রান্ত তর্কহতধী ও অসম্যগ্‌দর্শী আমি যদি মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে কোন মানুষ ছিল না, বা আমি মরিয়া গেলেও কোন মানুষ থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচার—যেমন মূর্খতা-মাত্র, কেন না, আমি মরিয়া গেলেও মানুষের কর্ত্তৃসত্তা থাকিবে, তদ্রূপ চিদ্ধামে চিদ্‌রসময়-ব্রহ্মের বিলাস বা বিচিত্রতা নাই,—এরূপ বলাও দুর্ব্বিচার বা বিচারভাব-মাত্র। উহা—অজ্ঞেয়তা-বাদিগণের (Agnosticsদের) ক্ষুদ্র ধারণা। নিত্যপূর্ণরসের রসিকগণ এরূপ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ নহেন।

গৌরসুন্দরের মহা-দান অপ্রাকৃত মধুর-রসের মহিমা

মধুর-রস চিদ্ধামে—পরাকাশে অতীব উপাদেয়ভাবে পঞ্চরসের পরম-চমৎকারিতা বর্ত্তমান। তথায় একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই 'বিষয়', আর সমস্তই তাঁহার 'আশ্রয়' বা সেবোপকরণ। এই পঞ্চপ্রকার রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রসই মধুর-রসের অন্তর্গত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর-রসের মধ্যে 'স্বক' ও 'পরক'-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুন্দরভাবে দেখান নাই। নিয়মানন্দ—কাহারও মতে যিনি—দ্বিতীয়-

শতাব্দীর, কাহারও মতে বা দশম-শতাব্দীর আচার্য্য, এবং বিশেষজ্ঞের মতে যাঁহার আবির্ভাবের পরিচয়—মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রচারিত, তিনিও উজ্জ্বলরসের আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদত্ত কৃপার মধ্যে সেই রসের প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। যাহা—জীবাত্মার সহজপ্রাপ্য, যাহা—জীবাত্মার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যাহা—কৃত্রিম সাধনপ্রণালী দ্বারা লভ্য বা সাধ্য নয়, যাহাতে—সকলের উপযোগিতা আছে, এইরূপ অসমোর্দ্ধ বস্তুই তিনি জগতে প্রচার ও প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র পরমকৃত্য ;—এইটাই তাঁহার মহা-বদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, নারদাদি-মুনিবরগণের, এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য দুর্গম ব্যাপার ব্রজের প্রেমধন পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন!

ঐতিহাসিকের ও নির্ব্বিশেষবাদীর দৃষ্টিতে কৃষ্ণ (?)

'কৃষ্ণ'শব্দদ্বারা তাঁহাকে কেহ কেহ একটী ঐতিহাসিকযুগের বা মহা-ভারত-যুগের জনৈক ব্যক্তিবিশেষ—যিনি পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন,—এরূপ মনে করেন। কেহ বা তাঁহাকে বিষ্ণুর একজন অবতার-বিশেষ, কেহ বা 'অবতারী'—যাঁহা হইতে বিষ্ণুর অবতারগণ আগমন করেন—এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কেহ বা মনে করেন—'কৃষ্ণ' কোন কবির একটী কল্পিত শব্দবিশেষ! কেহ বা মনে করেন,—কৃষ্ণভজন করিতে করিতে চরমে কৃষ্ণের বিনাশ (?) সাধন করিয়া জরা-ব্যাধ হওয়া যাইবে, তাঁহার রক্তিমাভ রাতুল-চরণ বাণবিদ্ধ করা যাইবে,—এইরূপ কত কি দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া থাকেন! কৃষ্ণপূজা করিতে করিতে জরা-ব্যাধ

হইয়া যাওয়া, কৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া চরমে নিরাকার নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করা প্রভৃতি—অক্ষজবাদী মনোধর্ম্মিগণের অপরাধময়ী চেষ্টা-মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ে তদভিন্নবিগ্রহ মহাপ্রভুর শিক্ষা

কিন্তু আমাদের শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সেরূপ কোনও কথা বলেন নাই ; তিনি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' হইতে দেখাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণের সর্ব্বকারণকারণত্ব

কেহ কেহ বলেন,—প্রকৃতিই জগতের কারণ ; কেহ কেহ বলেন,—ব্রহ্মই জগতের কারণ, কিন্তু ঐসকল কারণেরও কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির কারণ, ব্রহ্মের কারণ, সকল কারণের কারণ যিনি, তিনিই কৃষ্ণের রাতুল নিত্যপাদপদ্ম। সেই রাতুলচরণ—ব্রহ্মের কারণ, নাস্তিকত্ব-নিরূপণের কারণ, মানবজ্ঞানের, দেবতা-জ্ঞানের কারণ এবং এমনকি, তিনি নিজমূর্ত্তি নারায়ণেরও কারণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ বা নিরীশ্বর কপিলের বিচারে যে, প্রকৃতিই 'জগৎ-কারণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা বেদান্তের বিচারে যে, ব্রহ্মই 'সর্ব্বকারণ' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে, সেইসকল কারণেরও কারণ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

কৃষ্ণ—ব্রহ্মপ্রতীতিরও কারণ

জৈবধারণায় যে ব্রহ্মপ্রতীতি, তাহা ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিরাজ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে একটী আংশিক প্রতীতি বলিয়া অনুভূত হয়। সেই ব্রহ্মেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ। 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্'—মূলবস্তুর স্বভাব হইতে যে মহাজ্যোতির্ম্ময় একটী অঙ্গকান্তি নিঃসৃত হইতেছে, সেটী আভাসরূপ প্রতীতি-মাত্র। অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব-বস্তুপ্রতীতি

হইতে অসম্যক্ ভেদাভেদ-প্রকাশ—সম্পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণপ্রতীতির-ব্যাঘাত মাত্র; উহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মেরও কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। অভ্যুদয়বাদী হইয়া যে কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা, তাহা বর্ত্তমান-সময়ে 'পাণ্ডিত্য' হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রধান মূর্খতা। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জৈবজ্ঞানেরই প্রতিপাদ্য। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ;

কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি ও গোবিন্দ

কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তিনি কালাধীন অসৎ অচিৎ তত্ত্ব নহেন; তিনি নিত্য সদ্বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। কাহারও কাহারও ধারণা,—অচেতন বস্তু হইতে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছেন। সদানন্দ-যোগীন্দ্রের মতে ঈশ্বর যেরূপ একটী কল্পনা-মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অসৎ অচিদ্বস্তু নহেন। কালবিচারে তিনি—অনাদি; ব্রহ্মের প্রতীতি বা ধারণা—তাঁহার পরবর্ত্তিনী ধারণা; তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই। তিনি—গোবিন্দ; 'গো' অর্থে—পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এইসকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ। সবিশিষ্ট চিদাকাশ-পরমাত্মা ও নির্ব্বিশিষ্ট চিদাকাশ-ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি—গোবিন্দ।

কৃষ্ণেতর ধারণা; কৃষ্ণই পরিপূর্ণ 'সৎ' ও পরিপূর্ণ 'চিৎ'

কতিপয় মানবের বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার, পরমাত্ম-বিচার, মানুষের হিতকারি-গ্রাম্যদেবতা-বিচার প্রভৃতি আসিয়া স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি ঐসকলকেই চরমতত্ত্বরূপে মনে করিয়াছেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জৈবজ্ঞানের বিচারে তাদৃশ চরমতত্ত্ব (!) নহেন। তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও চেতনময় বস্তু, তিনি বদ্ধজীবের জ্ঞানাতীত নিত্যানন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া আছেন। তিনি নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম-মাত্র নহেন।

সমস্ত বৈচিত্র্য-ভাবসমূহের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই অবস্থিত; আবার, অভাবসমূহের অস্তিত্বও গৌণভাবে তাঁহাতেই অবস্থিত; সুতরাং ভাবাভাব-রাজ্যের ভাবসমূহ তাঁহাতেই অবস্থিত। 'সৎ' বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। শুদ্ধচিদনুভূতির আনন্দবাধক বস্তুই 'অসৎ'; আর, নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই 'সৎ'।

কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান, তদন্তর্গত ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতি

তিনি—চিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ-চেতনময়। অজ্ঞানি-জীবগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র-জৈবজ্ঞানে মূর্খতা-ক্রমে যাহাকে 'শেষপ্রাপ্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেটী—অচিৎ, সেস্থানেও চেতন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণজ্ঞান—মূর্খ অভিজ্ঞানবাদিগণের (Empericistদের) বিচারের দ্বারা গম্য,—এইরূপ কথা হইতেই নির্ব্বিশেষবাদ (Impersonality) উপস্থিত হয়। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ববস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন—তাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না; কারণ, তিনি মায়িক বস্তু নহেন। যাহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয়তত্ত্বই জীবের অসম্যক্-প্রতীতিতে 'ব্রহ্ম', আংশিক-প্রতীতিতে 'পরমাত্মা', পূর্ণপ্রতীতিতে 'বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্'। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাহা কিছু মাপিয়া লওয়া যায়, কখনও উহার অনুশীলন করিও না—উহা ভোগমাত্র। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তুর আলোচনা কর (ভাঃ ১।২।১১),—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অভিজ্ঞানবাদীর ব্যর্থতা

যে-সকল বস্তু মাপিয়া লওয়া যায়, তদ্বস্তু ব্যতীত মাপিয়া লইবার আরও অনেক বস্তু বাকী থাকে। তাই অভিজ্ঞানবাদী তত্ত্ব-বস্তুকে মাপিয়া

লইতে গিয়া খণ্ডপ্রতীতিতে আবদ্ধ থাকেন—বাস্তবসত্যের নিকট উপনীত হইতে পারেন না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

পরম বিদ্বান্ মহা-ভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী বলিয়াছেন (ভাঃ ১।২।৬)—

অধোক্ষজ-সেবা-পথই গ্রাহ্য

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

যদি কেহ আত্মার সুপ্রসন্নতা চা'ন, যদি কেহ যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ, বা ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিক্রমে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিত্য সেবা করিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবদ্বস্তুর অনুশীলন করুন।

নানা-মুনির নানা মত বা যত মত, তত পথে—কেবল বঞ্চনা ; অবতার বা অবরোহ-পথেই সিদ্ধি

আমাদের সঙ্কীর্ণ জৈবজ্ঞানে আমরা কখনও বয়োধর্ম্মে, কোন-সময়ে ত্যাগ-ধর্ম্ম, কোন-সময়ে বা গ্রহণ-ধর্ম্ম ইত্যাদি মনোধর্ম্মে ব্যস্ত। জগতের হাজার-হাজার লোকের হাজার-হাজার মত, প্রত্যেক লোকের এক-একটা নূতন মত। আমরা এই জগতের প্রত্যেকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে পারি। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশবস্তু যদি কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; (কঠ ১।২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

চৈতন্যবাণীর সার্ব্বভৌমত্ব সার্ব্বকালিকত্ব ও সার্ব্বজনীনত্ব, সুতরাং তাহাই অনুসরণীয়

ভগবান্ যখন নিজে প্রপঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিলেন, গৌরসুন্দর যখন প্রকটলীলা দেখাইলেন, তখন তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসের দ্বারা হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বাণী বাঙ্গালা-দেশের বা ভারতবর্ষের লোককে কিম্বা চারি-শত বর্ষের পূর্ব্বের কতকগুলি লোককে প্রতারিত করিবার বাণী-মাত্র নহে; চৈতন্যদেবের বাণী—নিত্যচেতন-ময়ী বাণী—চেতনরহিত প্রত্যেকবস্তুকে কৃপা করিবার বাণী। আমেরিকা, য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ-বিশেষের, অথবা শুক্র, মঙ্গল বা বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহবাসি-লোকের পক্ষে বুঝি একথা নহে,—এরূপ অনেকেই মনে করিতে পারেন। কিন্তু চৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে আমাদের যে পরিচ্ছিন্ন ধারণা, সেই মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহার নিকট আমরা না যাই,—যদি শরণাগতচিত্তে তাঁহার ঐকান্তিকদাসগণের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া তাঁহার কথা জানি, তাহা হইলেই জানিতে পারিব—উপলব্ধি করিতে পারিব যে, প্রত্যেক-দেশের ধর্ম্মজগতে প্রচারকগণ যেরূপ দোকানদারী করিয়া নিজেদের পণ্যদ্রব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঘোষণা-পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য সেইরূপ একজন বঞ্চনাকারী নহেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বৈশিষ্ট্য

তিনি লোকপ্রতারক সমন্বয়বাদীও নহেন। তিনি, জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হয় যাহাতে, সেই কথাই বলিয়াছেন। জগতের জাতিসকল যে-সকল কথা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার

চেতনময়ী বীর্য্যবতী কথা শুনিলে—উপলব্ধি করিলে, সেইসকল কথা সুদুর্ব্বলা বলিয়া বোধ হইবে। জগতের অতীব তুচ্ছ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাধন-প্রণালীকে মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় 'প্রকাণ্ড বড়' বলিয়া 'ফাঁপাইয়া' তুলিয়া যে বঞ্চনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য গৌরসুন্দর আসেন নাই।

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের তত্ত্ব ; তদ্‌রহিত ধর্ম্মই কৈতব

জগতের যত বড় সম্প্রদায় এবং যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদয় যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়, তাহা গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সমগ্র-জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায় কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন হওয়া চাই। যাহা কিছু ভোগ-বাঞ্ছা-মূলক ধারণা, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা 'কৃষ্ণের কীর্ত্তন' নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে যদি আমরা 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজত-ভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা 'নাম' বলিয়া ভুল কল্পনা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

জড়নামাক্ষরের সহিত কৃষ্ণনামাক্ষরের ভেদ

শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ, শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীকৃষ্ণাক্ষর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহারই নাম—'সঙ্কীর্ত্তন'। কিন্তু ইহা-দ্বারা কেহ যেন 'ছুঁচোর কীর্ত্তন'কে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া মনে না করেন। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ঐরূপ বা ঐজাতীয় কীর্ত্তন নহে,—কেবলমাত্র পিত্ত বৃদ্ধি করিবার কীর্ত্তন নহে,—মানুষের কল্পিত কীর্ত্তন নহে,—জড়-ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে,—ওলাউঠা ভাল করিবার কীর্ত্তন নহে,—সামান্য জড়-মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্ত্তন নহে.

কৃষ্ণকীর্ত্তনের বীর্য্য-বিক্রম ; মহাপ্রভুর দয়া

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের দুর্বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়ন-মাধবের, সদানন্দের তথা অপ্যয়দীক্ষিতের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের যথার্থ মুক্তিলাভ হইতে পারে,—কাশীর মায়াবাদি-প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে বিষয়ে আচ্ছন্ন ও অতি-অভিনিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে,—রাজা প্রতাপ-রুদ্রাদি তাহার প্রমাণ ; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্ব্বজীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে,—মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইবার কালে বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষীই তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। গৌরসুন্দর সকলের মঙ্গলের জন্য—উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, মানব,—প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন।

বিভিন্ন তর্কপন্থিগণের বিভিন্ন মতবাদ

পল্ কেরস্, বেন্, হিউম, হেগেল, বার্গ্‌শঁ, ক্যান্ট—ইঁহারা সকলেই মনীষী, আর Stoic Philosophersরাও মনীষী। আমাদের দেশের ষড়্‌দর্শন-প্রণেতৃগণ—মনীষী ; চার্ব্বাকও একজন মনীষী ; বৌদ্ধগণও মনীষী ; শাঙ্কর বৈদান্তিকগণও মনীষী ;—জগতে এইসকল হাজার-হাজার মনীষী হাজার-হাজার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যদি বুদ্ধিমন্ত হই—আমরা যদি বাস্তবসত্যের উপাসক হই—আমরা যদি কুহককে বা কৈতবকে 'সত্য' বলিয়া বরণ না করি—আমরা যদি সত্যস্বরূপ বাস্তব-ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রপন্ন হই, তাহা হইলে সেই বাস্তব-সত্যবস্তু যতদূরেই থাকুন না কেন,—হাজার-হাজার তথা-কথিত আচার্য্য, মহাজন বা দার্শনিক পণ্ডিত লোক তাঁহাদের মনীষার দ্বারা—গবেষণার দ্বারা হাজার-

হাজার মন-ভুলান ইন্দ্রিয়তর্পণের দোকানদারী কথা আমাদের নিকট উপস্থিত করুন না কেন, ঐ সকলগুলিকেই অনাদর করিয়া নিজেদের নিত্যচরম-মঙ্গল-লাভের জন্য আমরা সকল সময় নিত্য-বাস্তব-সত্যেরই অনুসন্ধান করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—
অবতার বা অবরোহ-পথ

চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা এই নির্ম্মৎসর সাধুগণের সতত-সেব্য সেই পরম-বাস্তব প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্যবস্তুর কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হাবিজাবির মধ্যে যাওয়ার কিছুমাত্র দরকার নাই, হাজার-হাজার দোকানদার তাঁহাদের নিজ-নিজ-দোকানের মন-গড়া জিনিষসমূহের প্রচার-প্রচলনের জন্য বিজ্ঞাপন-বিস্তার ও ক্রেতা সংগ্রহ (advertise ও canvas) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। যদি তাঁহাদের ঐসকল মনোহারিণী কথায় ভুলিয়া ঐসকল দোকানদারগণের দোকানে আমরা যাই, তবে আমরা নিত্যসত্যবাস্তব-বস্তু-লাভে বঞ্চিত হইব। কিন্তু আমাদের অচেতন-হৃদয়ে যদি চৈতন্যদেব উদিত হন—যদি চৈতন্য-হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন—যদি স্বয়ংপ্রকাশবস্তু নিজকে নিজে কৃপা-পূর্ব্বক প্রকাশ করেন, তবেই আমরা ঐসকল দোকানদারদিগকে অনায়াসে একেবারেই বাদ দিয়া (Summarily reject করিয়া) দিতে পারিব। সেই চেতনময় বস্তু স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নির্ব্বিশেষবাদ বিনাশ এবং বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ ও শুক্রাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি আত্মার ধর্ম্মই জানাইয়া দিয়াছেন।

ভাগবত-কথিত পরম ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভাগবতের (১।২।৬) "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই শ্লোক জগতে অন্য কোনও গ্রন্থে আছে কিনা, জানি না ; কিন্তু এই শ্লোকটী বিচার করিলে জগতের সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা বা লোকবঞ্চনাকারী তুচ্ছ সমন্বয়বাদ-স্পৃহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

অধোক্ষজ অক্ষজজ্ঞানীর স্বীকার্য্য বা অস্বীকার্য্য বস্তু নহেন

বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই ; কিন্তু পৃথিবীর মানুষগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত জগতের সর্ব্বত্র 'বুৎপরস্ত্' বা Idolatry চলিতেছে। নাস্তিক-সম্প্রদায় (Atheists) বলেন,—যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহে, তাহা 'বস্তু'-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না ; 'ঈশ্বর' যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ন'ন, তখন ঈশ্বর 'বস্তু' নহেন অর্থাৎ তাঁহার স্বতন্ত্র সত্য অস্তিত্ব নাই। সন্দেহবাদী (Sceptic) বলেন,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মোট কথা, সকলেই চায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বস্তু, বা ইন্দ্রিয়তর্পণের অন্যতম বস্তুরূপে ঈশ্বরকে। এই-সকল Agnostic, Atheist ও Scepticএর এরূপ ধারণা হইতে ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। নাস্তিক-সম্প্রদায় মনে করেন,—ঈশ্বর বুঝি তাঁহার খানাবাড়ীর রায়ত ! কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যে, ভোগময় জ্ঞানে বা দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

কে কে আচার্য্য বা মহাজন-শব্দ-বাচ্য নহেন ?

আমরা বর্ত্তমান-কালে ভগবদ্বিরোধি-মতবাদসমূহকে—ভগবদ্বিরোধিনী কথাসমূহকেই 'ভগবৎকথা' বা 'ভাগবত-কথা' বলিয়া মনে করি—

বিশ্বাস করি—আলোচনা করি এবং উহাদের ব্যাখ্যাতৃগণকেই 'মহাজন' বলিয়া বহুমানন করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (৬।৩।২৫),—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

দৈবী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি কখনও 'মহাজন' নহেন। ভ্রমাদি-দোষ-দুষ্ট কোন সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই—জগতের দোকানদারদের কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই; যে-সকল ব্যক্তি 'মহাজন' সাজিয়া,—ভক্তসম্প্রদায়ের মুখোস পরিয়া, মূঢ় নির্ব্বোধ সরলমতি লোকদিগকে কুপথে ও বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের কোন কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহারা মনুষ্যজাতিকে হিংসা করিবার জন্য উদার সমন্বয়বাদের নামে লোক-প্রতারণা ও নানা-প্রকার পাষণ্ডতা করিতেছেন, কিম্বা পৃথিবীর ভোগী মূঢ় লোকেরা যাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলিতেছেন, তাঁহাদিগের কোন কথাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা কেহই প্রকৃত মহাজন-শব্দ-বাচ্য নহেন।

ভাগবতের নিরপেক্ষ নিরস্তকুহক সত্য-বাণী

শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ পরমোচ্চ আদর্শ পরমোচ্চকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত "দোলো পুঁথি" নহেন, ইনি পরম-নিরপেক্ষ গ্রন্থ। কোন দেশের কোন-ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর কখনও লিখিত হয় নাই। আমাদের যোগ্যতা নাই, তাই দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যভাবে ভাগবত দর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি! কিন্তু তাই বলিয়া ভাগবতের 'নিরস্তকুহক'

সত্যে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই ভাগবত-সত্য প্রচার করিয়া আমাদিগকে 'জুয়াচোর'দের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের ত্রিগুণ জাত ধারণার সঙ্কীর্ণতা

আমরা বর্গ ও ঘন বস্তুকে বুঝিতে পারি, কিন্তু যাহার চতুর্থ আয়তন বা পরিসর (fourth dimension) আছে, সেরূপ বস্তুকে আমরা বুঝিতে পারি না—সেই তুরীয়-বস্তুকে আমরা ধারণা করিতে পারি না। Parabolic Curve (ক্ষেপণীক্ষেত্রকার বক্র রেখা) অথবা, two parallel straight lines (সমান্তরাল রেখাদ্বয়) কোথায় গিয়া মিলিত হয়, তাহা আমরা জানি না। মানবজ্ঞানে করণাপাটবদোষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ দোষচতুষ্টয়-দ্বারা সর্ব্বদা প্রতিহত হইবার যোগ্য। যা'কে তা'কে 'মহাজন', 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিয়া জ্ঞান বা বিশ্বাসই চঞ্চলতা।

স্বপ্রকাশ বাস্তব-সত্যবস্তুর কৃপালোকেই তিনি বেদ্য

বাস্তব সত্যবস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা তাঁহারই কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব নিত্যকাল প্রকাশমান। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোকসমূহ—ভূতপূজক, পুতুল-পূজক, কাল্পনিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের সেবক এবং তখনই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত অক্ষজজ্ঞানী পৌত্তলিক ব্যক্তিগণের কথা কিছুতেই শুনিব না।'

কর্ম্মী বা ফলশ্রুতিবাদী কখনও 'মহাজন' নহেন

পৃথিবীর বন্ধন হইতে মোচনকারী, ভোগসুখের আধার-ভূমি অনিত্য স্বর্গ বা স্বাধীনতার প্রদান-কারী লোকগণকে শ্রীভাগবতশাস্ত্র কখনও 'মহাজন' বলেন না ; তাঁহারা 'হিংসা-কারী জন'। বৈতানিক-কর্ম্মনিপুণ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাবটীকারী এক অজ্ঞানান্ধ আর এক অজ্ঞানান্ধকে অন্ধকার-রাজ্যে প্রেরণ করেন। যাহারা কর্ম্মালানে মূঢ় কর্ম্মিগণকে বন্ধন করেন, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিলে আমাদের কখনও সুবিধা হইবে না ; তাঁহাদের মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে প্রলোভিত হইলে আমাদের কখনও নিত্য-মঙ্গল হইবে না। আজকাল কলিকাতা-সহরে শুনিতে পাওয়া যায় যে, জুয়াচোরের দল 'মেকীসোনার তাল' দেখাইয়া অনভিজ্ঞ লোককে প্রলোভিত ও পরে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সপ্ত চেতনময়ী জিহ্বা

"চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—

(১) চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জক

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছেন না। যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের লোকের প্রতি আমাদের 'ছোট' বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের সকল লোকেরাই স্বরূপতঃ হরিভজন

করিতেছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ পঃ)—"সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে"—এই আত্মস্বরূপ-প্রতীতিটী উদিত না হইবে, সেকাল-পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

(২) ও (৩) সর্ব্বানর্থ-বিনাশক ও সর্ব্বশুভঙ্কর

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই—ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী; শ্রেয়ঃ-কুমুদ-বিকাশিনী পরমস্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার বিস্তারকারী অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই চরম-শ্রেয়ো-লাভ হয়।

(৪) পরবিদ্যার প্রাণ ও আশ্রয়

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূজীবন-স্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন"। পরবিদ্যাশ্রিত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না। যাঁহারা জড়-জগতে 'বড়' হইতে অভিলাষী, স্বর্গ-সুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা 'পণ্ডিত' নহেন। আমাদের দুর্ভাগা দেশের এখন ধারণা যে, যাঁহারা লেখা-পড়া জানে না, যাঁহারা—স্ত্রীলোক, ছোট-জাতি, অতি-সহজেই চোখে জল-বাহিরকারী প্রাকৃতসহজিয়া, অলস লোক, অবসরপ্রাপ্ত লোক (retired men), তাঁহাদের জন্যই হরি-কীর্ত্তন(?)! অথবা, যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, উদরভরণের জন্য, সুর-তাল-মান-লয় দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য 'দশা'য় পড়ে, ভাবপ্রবণতা (emotion) দেখায়, তাঁহারাই 'কীর্ত্তনীয়া' এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত ব্যাপারই—'কীর্ত্তন'! কিন্তু ঐগুলি কখনও 'হরিকীর্ত্তন' নহে; ঐগুলি ব্যবসায়—মায়ার কীর্ত্তন। যাহারা জহরৎ চিনে না, তাহাদিগকে যেমন প্রতারক ব্যবসায়ী কাচ দিয়া ঠকাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধারণ অজ্ঞ মূর্খ লোকগণকেও ব্যবসায়িগণ

সুর, মান, লয়, তাল দেখাইয়া কৃষ্ণেতর গীতকে 'হরিনাম' বলিয়া প্রতারণা করে।

(৫), (৬) ও (৭) সেবানন্দ-প্লাবনকারী, অনুক্ষণ পূর্ণামৃতের আস্বাদন-বর্দ্ধক, প্রেমসমুদ্রে সর্ব্বাত্মার মজ্জনকারী

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ অনুক্ষণ বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতের আস্বাদ-লাভ হইতে থাকে। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-ফলেই সর্ব্বাত্মার স্নান-লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয়ও নিশ্চয়ই 'হরিনাম' নহে বলিয়া জানিতে হইবে।

নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়

শ্রীহরিই একমাত্র সম্যক্রূপে নিরন্তর কীর্ত্তনীয়, আর জগতের যত অভিধেয়ের কথা আছে, উহাদের মূল্য—অন্ধ-কপর্দ্দকমাত্র। অন্যান্য অভিধেয়ের কথা উপাধিদ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত সরল ও নিরপেক্ষভাবে এইসকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 'কোন্ কথাটী গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

গৌরসুন্দরই স্বপ্রকাশ বিভুচৈতন্য ও কৃষ্ণপ্রেমদাতা

শ্রুতি বলেন,—ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ চেতনময় বস্তু। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য হইতে অসংলগ্ন হইয়া যে বিচার করে, তাহা কখনও যথার্থ বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে-জীব সেইরূপ চৈতন্যভক্তের নিকট চৈতন্যদেবের

বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পা'ন, তিনিই নিত্য বাস্তব-সত্যবস্তু গৌর-কৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতে থাকেন;—তাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য থাকে না। শ্রীচৈতন্যদেব জগতের অচেতন জীবের চৈতন্যবৃত্তি উদ্বোধন করিয়া সেই চৈতন্যবৃত্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)—

'শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সবে, বিশ্ব কৈলা ধন্য॥'

অন্যান্য অশ্রৌত অভক্ত সম্প্রদায় ও মহাপ্রভুর মত-ভেদ

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ-নিজ মনোহারী দোকানের পণ্যদ্রব্যসমূহের ক্রেতৃ-সংগ্রহকারী (canvasser), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন; কারণ, বদান্যতা (charity) ও ক্রেতৃ-সংগ্রহ-চেষ্টা (canvass) 'এক' কথা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—নিরস্তকুহক সত্যের প্রচারক। তিনি বলেন,—বাস্তব-সত্য স্বয়ংই সুকৃতিমান্ জীবের সেবোন্মুখ-বৃত্তির নিকট প্রকাশিত হন, সত্য জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। বন্ধমোক্ষবিৎ শ্রৌতপন্থিগণই—মহাজন, আর তর্কপন্থিগণ—মহাজন নহেন। প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহ—পরস্পর মতভেদযুক্ত, এবং বাস্তব-সত্য-বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে অসমর্থ বলিয়াই এইরূপ গোলমাল—গণ্ডগোল। কেহ বলিতেছেন,—'সূর্য্য, গণেশ, শক্তি বা নিরীশ্বরতার পূজা করিব।' কেহ বলিতেছেন,—'ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার রুচির—আমার খেয়ালের অনুরূপ হইবেন।' কেহ বা বলিতেছেন,—'ভগবানকে আমি এই মন দিয়াই গড়িয়া লইব, আবার এই মনের দ্বারাই আমার মনগড়া মূর্ত্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' এইরূপ নানা কুমতবাদ জগতে প্রচলিত আছে।

শ্রীচৈতন্য-বাণী ও অচৈতন্য-বাণী

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ কথা নহে। চেতন-বৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। কিন্তু অচেতন জাগতিক লোকদের তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু কার্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় কখনও হিংসার কথা বলেন না। জগতের কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরগণ তাৎকালিক অভাব-প্রতীকারের চেষ্টা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতেছেন মাত্র। অসত্যকে 'সত্য' মনে করিয়া লইয়া যে প্রতারণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত নিত্যমঙ্গল হইতেছে না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের যথার্থ নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সতত যত্নবন্ত ; প্রথম বাধা—আমাদের স্থূলদেহ, দ্বিতীয় বাধা—আমাদের মন।

অধোক্ষজের ইন্দ্রিয়-তর্পণেই নিত্যমঙ্গল

যাহা জড়েন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা গৃহীত হয়, উহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তু-মাত্র ; তাহা 'ভগবান্' নহে। উহাকে নিত্য-মঙ্গলার্থি-জনগণের সেবা করিবার আবশ্যকতা নাই। জড়জগতে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তিসমূহেরই তাণ্ডব নৃত্য। কিন্তু ভগবান্ অধোক্ষজের সেবকসূত্রে একমাত্র ভগবানেরই ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বিধান করিবার জন্য যদি আমরা সকলে মিলিয়া ভগবানের সেবা করি, তবেই আমাদের নিত্য-মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

গৌরানুগত্যের লক্ষণ

কাহারও কাহারও মতে,—ভগবান্ একজন ইন্দ্রিয়তর্পণযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহকারী (order-supplier) ; তাই আমরা

অনেক-সময় 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন,—বণিক্ হইও না। তাঁহার ভক্তগণ—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩)—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎসেবকের ভগবৎসেবা ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। যাহার যে কিছু বস্তু আছে বলিয়া অভিমান আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা-দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ'-ধর্ম্ম।

শ্রেয়ঃপ্রদাতা ও প্রেয়ঃপ্রদাতার ভেদ ; গৌরভক্তই শ্রেয়ঃপ্রদাতা

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন,—'হে জীব! তুমি স্বরূপতঃ কে, তাহা আগে জান।' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের 'অপ্রিয়' বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যেরূপ অবাধ্য শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে এবং সদ্বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও তদ্রূপ জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-মানব-জাতির রুচির প্রতিকূলে চেতনময় কথা বলিলেও তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলেই ভীত হইতে

হইবে না; তাঁহারা আমাদের বহির্ম্মুখ হৃদয়গ্রন্থিরূপ পচা-ঘা বা বিস্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া স্বাস্থ্যবিধান বা মঙ্গলসাধনের জন্যই আসেন। 'দলাদলি করিব', 'অপরের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিক-তর প্রতিভা-সম্পন্ন আর একটী নূতন মত স্থাপন করিব',—এইরূপ ইচ্ছা কখনও শ্রীচৈতন্য-ভক্তের নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন

স্থান—মহা-যোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

কাল—মঙ্গলবার, ১২ই মাঘ, ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীনামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন এবং শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অপর সাধন-প্রণালীর প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

চতুর্য্যুগের বিভিন্ন অভিধেয়

পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ১২।৩।৫২)—

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥'

সত্যযুগের ধ্যান কলিতে অসম্ভব ; অধোক্ষজ-ধ্যানের বিচার

বর্ত্তমান কাল—কলি ; এই কালে ধ্যানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে ;—লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত, সুতরাং এখন বিষ্ণুর ধ্যান সম্ভবপর হয় না। আমরা অনেক-সময়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়কেই চিন্তা করি ; সুতরাং অধোক্ষজ-ধ্যানের সম্ভাবনা অতি-অল্পই। ধ্যানপ্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিচার করা আবশ্যক যে, কে ধ্যান করিতেছেন, কাঁহার ধ্যান করিতেছেন এবং সেই ধ্যানই বা কি? ধ্যেয়বস্তু বাস্তব-সত্য বস্তু হওয়া আবশ্যক, ধ্যাতার বাস্তব নিত্যসত্তা থাকা আবশ্যক এবং ধ্যান-ক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহত-গতি-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক ; নতুবা প্রকৃত ধ্যান হয় না।

কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যান অসম্ভব

বর্ত্তমান-কালে বিক্ষিপ্ত-চিত্তবৃত্তিতে—কলিকল্মষ-পূর্ণ-হৃদয়ে ধ্যেয়-বস্তু সর্ব্বদা নিজ-রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে-সকল বিষয় আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আমাদের ধ্যেয়বস্তু হয়, নিত্যবাস্তব অধোক্ষজ সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হন না। সত্যযুগে বাস্তব-সত্যবস্তু ধ্যানের বিষয়ীভূত হইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছেন; সুতরাং সত্যের সাধনপ্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্ত-চিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হন না। বিক্ষিপ্ত-মনের দ্বারা প্রকৃত ধ্যেয়বস্তুর ধ্যান হয় না—অন্যবস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিকসূত্রে যে-সকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার—নিষ্পাপ নির্ম্মল অবিক্ষিপ্ত চিত্তের অভাব-নিবন্ধন ধ্যান-ক্রিয়া অসম্ভব।

ত্রেতা-যুগ যজ্ঞেশ্বরের যজন

ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর যজনকার্য্য যজ্ঞদ্বারা সাধিত হইত। ত্রেতা-যুগের অনুশীলনের বিষয় 'মখ' বা 'যজ্ঞ'। যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও হোতা—চতুর্ব্বিধ পুরুষের এবং সমিধ্, আজ্য, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণের আবশ্যকতা। ত্রেতা-যুগে অসুরকুল যজ্ঞবিধির প্রতি প্রথমতঃ তত আক্রমণ করে নাই; পরে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন নানা-ভাবে যজ্ঞ-ক্রিয়া আক্রান্ত হইতে থাকিল।

যজ্ঞেশ্বরের যজন ছাড়িয়া ক্রমশঃ ইতর দেবোপাসনারম্ভ

ত্রেতা-যুগে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমন্ত লোকগণ যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুরই আরাধনা করিতেন এবং যজ্ঞেশ্বরের অবশেষ-দ্বারা

দেবতা-বৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। অপরাপর লোকসমূহ যজ্ঞদ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের আরাধনা করিত; ক্রমশঃ ইতরলোকগণ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা না করিয়া ইতর দেবতাগণকেও বিষ্ণুর সম-পর্য্যায়ে গণনা করিতে লাগিল।

চার্ব্বাকের নাস্তিক-মত

চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পিতৃযজ্ঞে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'ধূর্ত্তপ্রতারক-গণই পিতৃশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং রাজন্যবর্গকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা নিজ-নিজ-পরিজনবর্গ প্রতিপালন করিবার জন্যই ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে হনন করা যায়, সে স্বর্গলোকে গমন করে;—যদি ইহাই সত্য হয় এবং এইসকল বাক্যে যদি যজ্ঞকারিগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞে আপনাপন পিতা-মাতা-প্রভৃতির মস্তক ছেদন করে না কেন? তাহা হইলে ত' অনায়াসেই পিতা-মাতা-প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকেও আর পিতা-মাতার স্বর্গ-লাভের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না! আর শ্রাদ্ধ করিলেই যদি মৃতব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে তাহার উদ্দেশ্যে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে! আর যদি এই-পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যাহা-দ্বারা কিঞ্চি-দুচ্চে স্থিত ব্যক্তিরই তৃপ্তি হয় না, তদ্দ্বারা আবার কিরূপে অত্যুচ্চ-স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হইবে? অতএব পিতৃশ্রাদ্ধাদি—কেবল ধূর্ত্তগণের উপজীবিকা-মাত্র; বস্তুতঃ উহা-দ্বারা কোনও ফল-লাভ হয় না' ইত্যাদি।

দ্বাপর-যুগে বিষ্ণুর অর্চ্চন

যখন ত্রেতা-যুগে যজ্ঞকার্য্যের বিধান আক্রান্ত হইল, তখন দ্বাপরের প্রবৃত্তিকাল। তখন অর্চ্চন-দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ব্যবস্থিত হইল। বিষ্ণুর আরাধনায় পশুবধ উদ্দিষ্ট হয় না। উষঃ, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য দেবাদির বা পিতৃকুলের পূজা-প্রণালী—যাহা ত্রেতা-যুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই দ্বাপরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচর্য্যা-ক্রিয়ায় পরিণত হইল। সাত্বতগণ যে-ভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন, তাহাই বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালী। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত রবি, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানগম্য নানা-দেবতাগণের পরিচর্য্যাদিই অসাত্বত-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইল।

কলিকালে পরিচর্য্যার ব্যাঘাত

দ্বাপরান্তে কলিপ্রারম্ভে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও দৈব ও পিত্র্য-কর্ম্মের এবং বিষ্ণুর উপাসনার ব্যাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বকালেই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকুল সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিষ্ণুপূজা উপলক্ষ্য করিয়া দেবল-সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইল। এইসকল দেবল-সম্প্রদায় বিষ্ণুপূজার ছল করিয়া উদরভরণাদি-কার্য্যে লিপ্ত হইল—বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে জিহ্বোদরপূজায় রত হইল—সেবার পরিবর্ত্তে ভোগে লিপ্ত হইল। কলিতে দ্বাপরের বিষ্ণুপরিচর্য্যা হইবার পরিবর্ত্তে উদরপরিচর্য্যা, স্ত্রী-পুত্র-সেবা বা দেহসেবা হইতেছে দেখিয়া সাত্বতগণ অন্য ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন।

কলিযুগের ধর্ম্ম বা হরিভজন-প্রণালী

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি স্ব-কৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতার এই সাত্বত-বচন-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥"

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিয়াছেন ; কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীনামরূপী ভগবান্ হরির পূজা হইয়া থাকে।

কলিকালে অর্চ্চন-ব্যভিচার

দ্বাপরযুগের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীর ব্যভিচারের 'ছিট্' বর্ত্তমান-কালেও আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বাপরের সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যার সহিত পাল্লা দিবার জন্য যেরূপ অবান্তর পূজা-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে যেরূপ উদরপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমান-কালে তাহারই নিদর্শনাবশেষ রহিয়াছে। এখন বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নানাবিধ দেবদেবীর পূজা-রূপ দেবলবৃত্তি চলিতেছে। এখন শ্রীনারায়ণপূজার পরিবর্ত্তে 'শালগ্রাম দিয়া বাদামভাঙ্গা'র কার্য্য অবাধে চলিতেছে! বাহিরের দিকে অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া লওয়া হইয়াছে ; তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন ও নানাবিধ ভোগ চলিতেছে!

কলিযুগে কীর্ত্তনবিধি ও তাহার ব্যভিচার

কলিকালে দ্বাপরীয় অর্চ্চন হইবার উপায় নাই ;—কলিকালে শ্রীনাম-দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হইবে অর্থাৎ কলিকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে বিষ্ণুর অনুশীলন হইবে। কিন্তু কলিতে যেরূপ সাত্বতগণ-যাজিত দ্বাপরীয় অর্চ্চন-প্রণালীর ব্যভিচার করিয়া আমরা উদরের পূজা করিবার জন্য 'দেবল' হইয়া পড়ি, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও তদ্রূপ ব্যভিচারে অবস্থিত

হইয়া আমরা নামবিক্রয়ী হইয়া পড়ি। আমরা গ্রন্থ পড়ি, গ্রন্থ প্রকাশ করি, উদ্দেশ্য—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ। আমরা 'নাম' (?) করিয়া অর্থ লই—উদর ভরণ করি; আমরা কীর্ত্তনীয়া হই, উদ্দেশ্য—কীর্ত্তন নয়, হরি-সেবা নয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ। আমরা যদি অন্যকার্য্যে বেশী পয়সা পাই, অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাই, তাহা হইলে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া অন্যকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত হই। যদি কেহ বলেন,—'ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা পাইবে না', তখন আমরা পাঠ ছাড়িয়া দেই, তখন আমরা বলি,—'ভাগবত আর দুধ দেয় না।' কেহ যদি বলেন,—'কীর্ত্তন করিয়া পয়সা পাইবে না—মন্ত্র দিয়া পয়সা পাইবে না—বক্তৃতা দিয়া অর্থ পাইবে না', তখন আমরা লোকের দ্বারে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দেই, মন্ত্র দেওয়ার ব্যবসায় ছাড়িয়া দেই, বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করি। কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা পাইলে আমাদের কপট-সেবার অভিনয়টুকুও বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের হরিনাম-কীর্ত্তন (?), আমাদের ভাগবত-পাঠ (?) বা বক্তৃতা (?) কলিসহচর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তির জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐসকল অভিনয় কখনও নামকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ বা বক্তৃতা নহে। ঐসকল চেষ্টা—নামাপরাধ, ঐসকল চেষ্টা—ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি-মাত্র। বণিগ্‌বৃত্তি কখনও 'সেবা' নহে—"ন স ভৃত্যঃ, স বৈ বণিক্।" ঠাকুর দেখিয়া যদি কেহ ভেট না দেয়, তবে আমি ঠাকুর-পূজা ছাড়িয়া দেই; 'আমার উদরভরণের জন্যই ত' আমার ঠাকুর-পূজা (?) ভাগবত-পাঠ (?), বা নামকীর্ত্তন (?)!' এইরূপ কার্য্য কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল না—মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এইপ্রকার জঘন্য কদর্য্য ব্যবসায় করেন নাই। পরযুগে লোকে ভাগবতবিক্রয়ী, মন্ত্রবিক্রয়ী, নামবিক্রয়ী হইবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ ভাগবত, সাক্ষাৎ নামি-কৃষ্ণস্বরূপাভিন্ন শ্রীনাম,

সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে দাঁড় করাইয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সেবা করাইয়া লইবে,—এই ঘৃণিত উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস বা ষড়্-গোস্বামিগণ কখনও জগতে হরিনাম প্রচার বা ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন নাই বা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দেন নাই।

ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের ব্যভিচার

প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও চারিযুগের কৃত্য অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তন ন্যূনাধিক উদিত হইয়া থাকে। যখন জীব আত্মবৃত্তির অনুশীলন-দ্বারা শুদ্ধহরিসেবোন্মুখ হয়, তখনই ঐসকল কৃত্য শুদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন জীব মনোধর্ম্মে অভিভূত থাকে, তখন তত্তৎ সাধনপ্রণালীরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। মনোধর্ম্মের বশে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই 'ধ্যান' করি, ইন্দ্রিয়ের ভোগানলে আহুতি-প্রদানকেই আমরা 'যজ্ঞকার্য্য' বলিয়া মনে করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকটে নৈবেদ্য দেওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করি,—'জিনিষগুলি কোন্ সময়ে বাড়ী লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনকে দিব এবং নিজে ভোগ করিব', কীর্ত্তন করিবার সময় সুর-তান-লয়-মানের অহঙ্কারে আবদ্ধ থাকিয়া চিন্তা করি,—'কিসে আমার কীর্ত্তন শ্রোতৃবর্গের চিত্তের অনুকূল হইবে, তাহাদের কর্ণাভিরাম হইবে' ইত্যাদি। তখন ভগবান্ স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যান,—আমরা কৃষ্ণকর্ণোৎসব-বিধানের পরিবর্ত্তে জড়কর্ণোৎসব বিধান করিয়া থাকি; তখন আমার কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই অর্থাৎ কামাগ্নিতেই ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কলিকালে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের ব্যাঘাত

কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান অসম্ভব। 'বিক্ষিপ্তচিত্তকে প্রত্যাহারাদি-দ্বারা সংযত করিয়া পরে ধ্যান করিব'—এরূপ আশাও নিষ্ফল;

কারণ, মনোধর্ম্মি-জীবের ব্যবহিত ধ্যান-দ্বারা নিত্য বাস্তব-চিদ্বিগ্রহ ধ্যাত হইতে পারেন না। মনোধর্ম্মানুষ্ঠিত ধ্যান 'ধ্যান' নহে; নির্ম্মল আত্ম-বৃত্তির দ্বারাই ধ্যান সম্ভব। কলিকালে যজ্ঞবিধিরও সম্ভাবনা নাই; কারণ, বহুদ্রব্যসাধ্য ও বহুকালসাধ্য যজ্ঞাদিতে কলির জীবের ক্ষুদ্র পরমায়ু নষ্ট করিবার সময় নাই। কলিকালে দুর্ব্বলজীবের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্য্যাও সম্ভবপর নহে। পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ আসনে বসিলেই পিঠের দাড়া ব্যাথা পায়; বিশেষতঃ, অনেক-স্থলে এবং অনেক-সময়েই কাল, স্থান, পাত্র ও নৈবেদ্যাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার সম্ভবপর নহে; অথচ শৌচাশৌচাদি-বিচার পরিচর্য্যা-কালে বিশেষ আবশ্যক,—কালাকাল বিচারও আবশ্যক।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্থান-কাল-পাত্র-বিচারের অপেক্ষা-রাহিত্য

কিন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনে স্থানাস্থান, কালাকাল, পাত্রাপাত্রের বিচার নাই (চৈঃ ভাঃ মধ্য),—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

এমন কি, মলমূত্রাদি-ত্যাগকালেও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা যায়। বাহ্য-ক্রিয়া-সমূহ অভ্যাসেই হইয়া থাকে। হরিনাম করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রা-কালে, জাগ্রতাবস্থায়, শয়ন-কালে আমরা হরিনাম গ্রহণ করিতে পারি। আভিজাত্যসম্পন্ন থাকিয়া বা নীচকুলোদ্ভূত হইয়া যে-কোন অবস্থায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়। শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, স্ত্রীপুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই হরিনাম-গ্রহণের অধিকারী। নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ

করা যায়, গণ্ডগোলে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, একা হরিনাম গ্রহণ করা যায়, বহুলোক একত্র মিলিয়া হরিনাম গ্রহণ করা যায়, হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়।

সিদ্ধি-লাভে ব্যাঘাতের কারণ

তথাপি এই ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করিয়া যদি আমরা আর কিছু করিয়া বসি,—লোককে দেখাইবার জন্য গাত্রাবরণীর ভিতরে ঝুলিটী রাখিয়া বাহিরে আমার কপট দৈন্য, তৃণাদপি সুনীচতার বা প্রতিষ্ঠাশা-হীনতার বিজ্ঞাপন প্রচারেচ্ছা, অথচ, অন্তরে লোক-দেখান বৈষ্ণবতা (!) পরিপূর্ণ-মাত্রায় থাকে,—কপটতা করিয়া, অহং-মমাদি বুদ্ধি লইয়া, অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' জানিয়া, বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া সাধু-নিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ করিয়া, অসাধুকে বহুমানন করিয়া, নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ফল-লাভে বঞ্চিত হইলাম! গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নাম

নামি-শ্রীভগবান্ অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া নিজনামসমূহের বহু-সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই অভিন্ন নামসমূহে তাঁহার সকলপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। 'বহু-সংখ্যা' শব্দে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ; তন্মধ্যে মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, গোপীজনবল্লভ, যশোদানন্দন, নন্দকুমার প্রভৃতি এবং ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, নারায়ণ, নৃসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতিই মুখ্য নাম; আর, আংশিক বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক

'ব্রহ্ম','পরমাত্মা', 'ঈশ্বর'াদি নামসমূহই ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্য নামসমূহ—নামীর সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন; তাঁহাদের মধ্যে সকল শক্তি একাধারে সম্পূর্ণভাবে অর্পিত আছে; পরন্তু গৌণ নামসমূহে বিবিধ শক্তি আংশিক ও ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে বর্ত্তমান।

সকল-জাতীয় মানবেরই হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার

জগতের সকল-শ্রেণীর লোকেরই হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, উভয়েই শ্রীনামাচার্য্য। নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে একথা বলেন নাই,—"তুমি যবনের ঘরে জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণের কৃত্য হরিনাম করিও না।" তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে বলিলেন,—'তোমরা উভয়েই সমভাবে জগতের প্রতি দ্বারে-দ্বারে গিয়া হরিনাম-প্রেম প্রচার কর।' পূর্ব্ববিধি-অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর-জাতির সহিত কোনপ্রকার ব্যবহার করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণতা হইতে পতিত হইয়া যান। কিন্তু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু প্রপঞ্চে উপাধ্যায়-কুলে অবতীর্ণ হইয়াও নিখিল পতিতগণের পাবন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-নবশাখ কিম্বা সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বা কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে হরিনাম প্রদান করিলেও পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু কিছু পতিত হন নাই।

নিত্যানন্দপ্রভুর ও ঠাকুর হরিদাসের আদর্শ নামাচার্য্যত্ব

নিত্যানন্দপ্রভু কখনও উদরভরণ-চেষ্টায় বা অর্থাদির লোভে কাহাকেও নামাপরাধ প্রদান করেন নাই। তিনিই চৈতন্যরসবিগ্রহ শুদ্ধ-হরিনাম বিতরণ করিতে সমর্থ। তাই তিনি পতিতপাবন—জীবোদ্ধারণ। আর

যাঁহারা-'অহং মম-ভাব' লইয়া অর্থবিত্তাদির লোভে হরিনাম-প্রদানের ছলে 'নামাপরাধ' প্রদান করেন, তাঁহারা নীচজাতির সংসর্গ-ফলে পতিত হইয়া যান। হরিদাস-ঠাকুরও আচার্য্যের কার্য্য করিতে অযোগ্য ন'ন।

হরিদাস-ঠাকুরের দৃষ্টান্ত-দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্ব্বজীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আভিজাত্য বা সামাজিক মর্য্যাদার সহিত পারমার্থিক উচ্চাবচ-ভাবের সম্বন্ধ নাই। পারমার্থিকই প্রকৃত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণোত্তম, এবং অ-পারমার্থিকের সামাজিক মর্য্যাদা—ছলাভিজাত্য-মাত্র; উহা হরিনামগ্রহণের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৮।২৬) ও কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ভাষায় ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥"

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥"

'শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর জাতির মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে নাই—নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হরিনাম কার্ত্তন করিবার অধিকার নাই'—এরূপ কথা মূল-পুরুষের আচরণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের দাস—কুলীনগ্রামবাসী বসু-রামানন্দপ্রভু বিশেষ-মর্য্যাদা-যুক্ত কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও সুবর্ণবণিক্-কুলে অবতীর্ণ উদ্ধারণ-ঠাকুরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবাবির্ভাবের ফল, প্রারব্ধাপ্রারব্ধ কর্ম্মফল-বিচার

প্রপঞ্চে যে-কুলে মহাভাগবত অবতীর্ণ হন, সেই কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন 'শতপুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন, মধ্যম ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'চতুর্দ্দশ পুরুষ' উন্নত হন, আর কনিষ্ঠ ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'তিনপুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন বৈষ্ণব কখনও কর্ম্মফলের বাধ্য নহেন। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্' প্রভৃতি বিধি ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। অনেক-সময়ে জীবের পাপফলে কুষ্ঠরোগীর ঘরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম-লাভ হয়; আবার, পুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট সামাজিক আভিজাত্য-লাভ হয়; কখনও বা শ্রীমানের ঘরে যোগভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মফল-বশতঃ জীব জন্ম গ্রহণ করেন। এইসকলই প্রাক্তন-ফল—কর্ম্মমার্গের কথা; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে সেরূপ কথা নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলেন (শ্রীনামাষ্টকে ৪র্থ শ্লোক),—

"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

অবিচ্ছিন্ন-তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারাও ফলভোগ ব্যতীত যে-সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম বা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, নামস্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেইসকল ফল সম্পূর্ণভাবে অপগত হয়—এই কথাই বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রাপঞ্চিক ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের হেয়ত্বাদি জড়ধর্ম্ম-সংস্পর্শাভিনয়ের সূক্ষ্ম মর্ম্ম

তবে যে প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হন, প্রাপঞ্চিক চক্ষে 'মূর্খ' 'রোগগ্রস্ত' প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও মহদুদ্দেশ্য আছে। সাধারণ লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল

উচ্চকুলেই আবির্ভূত হন, বলিষ্ঠ বা জড়বিদ্যার পাণ্ডিত্যরূপেই বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণ সকল-লোকের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিবার জন্য বিভিন্ন-শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া অন্যান্য দীন অযোগ্য জীবের প্রতি পরম-দয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ক্রিয়াটী—পালিতা শিক্ষিতা হস্তিনী প্রেরণ করিয়া 'খেদা'র মধ্যে বন্যহস্তী ধরিবার ব্যবস্থার ন্যায় জানিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও বলিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ ও মধ্য ৯ম অঃ)—

"শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব, সবারে করেন ত্রাণ ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥"
"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ,—সেই পরানন্দ-সুখ ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥"

গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি লঘু-জীবের ব্যবহার-বিধি

ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে করিতে হইবে না যে, 'ঐ ব্যক্তি পাপযোনি লাভ করিয়াছেন,—কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নীচ-শূদ্র-ম্লেচ্ছাদি-কুলে উদ্ভূত হইয়াছেন'; পরন্তু জানিতে হইবে যে, তিনি নীচকুলাদি পবিত্র করিয়াছেন। আমরা আলাপচ্ছলেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি,—'আপনি কোন্ কুল পবিত্র ক'রেছেন ?' কোন মহাপুরুষ যদি কলিযুগের একমাত্র সাধনপ্রণালী শ্রীনামকীর্ত্তনে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ,—সন্দেহ নাই।

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।

সময়—সায়ংকাল, বুধবার, মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী, ২০শে মাঘ, ১৩৩২

[শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে আশ্রিত জনগণের প্রতি উপদেশ]

ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিবিধ শক্তি

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত-শক্তির বিভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে শক্তিসমূহ অন্তর্নিহিত আছে। শক্তিমানের চেতনশক্তিতে যে নিজত্ব আছে, তদ্বিপরীত তাঁহার অচিচ্ছক্তিতে সেই বৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাব বিরাজমান। ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তিতে কেবল চেতন বা চিন্মাত্র অবস্থিত; তাঁহার তদ্বিপরীত-শক্তিতে কেবল-অচিৎ অর্থাৎ গুণত্রয় অবস্থিত—উহারাই বহিরঙ্গা-শক্তির বৃত্তিত্রয়।

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত জীবের ধর্ম্ম-বিচার

ভগবানের দ্বিবিধ অঙ্গের অন্তরালে তট-প্রদেশে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাতে জীবত্বের উপাদান নিহিত আছে। জীবগণ—পরিমিত ও অসংখ্য, আবার তাহারাই একতাৎপর্য্যপর ও চিন্ময়। জীবের সহিত অচিচ্ছক্তির বৃত্তিত্রয় ত্রিগুণ, এবং ত্রিগুণোত্থ সংখ্যা-গত বহুত্ব ও বস্তুবিশেষের চতুষ্পার্শ্ব—তাহাদের বৈশিষ্ট্য-সাধনের সহায়। অচিচ্ছক্তির পরিণামের পরিচয়-সাম্যে আমরা জীবের অসংখ্যত্ব ও অণুচিদ্ধর্ম্ম লক্ষ্য করি। বহিরঙ্গ-শক্তি-ধর্ম্ম তটস্থ-শক্তি-ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তরঙ্গ-চিচ্ছক্তি-ধর্ম্ম যে জীবত্বে নাই,—এরূপ নহে। চিচ্ছক্তিবৃত্তি—জ্ঞাতৃত্ব, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও অনুভবিতৃত্ব—তটস্থা-শক্তিতেও বর্ত্তমান।

জীবের বদ্ধতার ও তাটস্থ্যের পরিচয়

এই জীব স্বরূপতঃ অণুচিৎ হইলেও সংখ্যায় অনন্ত, এবং ত্রিগুণের সহিত ন্যূনাধিক মিলন-প্রয়াসী। জীব অণুচিৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে অন্তরঙ্গা-শক্তির বৃত্তিত্রয়—অসংযতভাবে ও অবৈধভাবে বহির্জগতের গুণত্রয়ের সহিত মিলন-ফলে বিকার-যোগ্য। বহিরঙ্গ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইবার যোগ্যতায় অণুচিদ্ধর্ম্ম আশ্রিত, এজন্য অণুচেতন জীব—গুণ-মায়া ও ভক্তিযোগ-মায়ার ভূমিকাদ্বয়ে বিচরণশীল। অণুচেতন জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি—সম্বিদাশ্রিতা; তাঁহার জ্ঞাতৃত্বের অস্মিতায় তিনি অচিচ্ছক্তি-পরিণত নশ্বর প্রপঞ্চে সম্বিদ্‌বৃত্তির পরিচালনে বা জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত। যে-সময়ে তাঁহার নিজ-জ্ঞাতৃত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তখনই তিনি নিশ্চেষ্ট ও তটস্থধর্ম্মে অবস্থান করেন। ভগবানের অচিচ্ছক্তির আধার জড়াকাশে স্বীয় স্থূল অস্তিত্বের জ্ঞাতৃত্ব পরিচালন করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়সাহায্যে বহির্ব্বস্তুর ভোগরূপ নৈসর্গিক ধর্ম্ম সময়বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে তিনি যে-সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—অণুচিৎএর অনাদি-ধর্ম্ম, এবং নশ্বর ভূমিকায় পরিচালিত হইবার যোগ্যতা-হেতু বিনাশ-যোগ্য। কর্ম্মপ্রবৃত্ত কর্ত্তা বৈদেশিক-গুণত্রয়ের অভিমানে স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া ফেলেন। সত্ত্বগুণাবলম্বনে তিনি স্বরূপের কিছু পরিচয় পাইলেও নশ্বর রজস্তমো-গুণ-মিশ্রভাবের অনুভূতিক্রমে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম করেন। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তা যখন রজস্তমোবৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয়তার জন্য ব্যস্ত হন না, তখনই তিনি সৎকর্ম্মনিপুণ সাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

জীবের মুক্তির পরিচয়

বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই সেবকের স্বরূপানুভূতি হয়। কোন্ বস্তুর সেবা করিতে তাঁহার নিত্যা বৃত্তি বর্ত্তমানা, তদনুসন্ধান-ফলেই তিনি শক্তিমান্

ভগবান্ বাসুদেবের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী হন। তখন সমগ্র-জগতের প্রতি তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি নিরস্ত হওয়ায় নিত্য-ভোক্তা ভগবানের সেবোপকরণরূপে তিনি স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করেন।

জীবের গৌণ-ভূমিকায় ক্রিয়া

রজস্তমো-গুণে গুণী হইয়া সত্ত্বের ন্যূনাধিক বিলোপ-সাধনফলে তাঁহার ভগবৎসেবা-বিমুখী বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তখনই খণ্ডিত নশ্বর বস্তুসমূহের সেবা তাঁহাকে ভগবৎসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করে। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, অনুভবিতৃত্ব ও ইচ্ছার সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া মিশ্র-গুণজাত আধারের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থাতেই তাঁহার কর্ম্মপথে বিচরণ-প্রচেষ্টা। জড়-ভোক্তার অভিমানে তিনি আপনাকে 'দেহী' না জানিয়া 'স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়'কেই 'দেহী' বলিয়া ধারণা করেন। যাঁহারা এরূপ বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত, তাঁহারাই ফলভোগ-বাদের প্রচারক পূর্ব্বমীমাংসকের কর্ম্মাগ্নি-প্রজ্বালনের ইন্ধনস্বরূপ হইয়া পড়েন এবং স্বীয় ভগবৎসেবোপ-করণত্বের-বিচার বিস্মৃত হন। ফলভোগবাদী কর্ম্মিসম্প্রদায়—ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে প্রাকৃত নশ্বরবস্তুর সেবায় নিরত।

শুদ্ধসত্ত্বের ক্রিয়া

যে-কালে জীব বিশুদ্ধসত্ত্বের আধারে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই তিনি কর্ম্মপথের অকর্ম্মণ্যতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অসম্পূর্ণতা বা ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি অবর-ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অচিচ্ছক্তির অনুপাদেয় করাল দংষ্ট্রেপিষ্ট হইবার যোগ্যতাকে আদর করেন না; অণুচেতন জীব বাহ্যজগতে অচিদ্‌বস্তুর সেবনপ্রবৃত্তি পরিহার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে যখন সবিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান-কার্য্যকে আদর

করেন, তখন উহাই তাহার অবিদ্যা-রহিত স্বরূপোদ্বোধিকা বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই জীব ক্রমশঃ অণুচেতনের 'ভোক্তৃ-ভোগ্য'-ভাব হইতে পৃথক্ হইবার আয়োজন করেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর লক্ষণ-বিচার

অণুচিৎ জীব গুণত্রয়ের রাজ্যের অবরতা লক্ষ্য করিয়া কখনও অখণ্ড-কালের করাল-কবলে বিলীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনা-ক্রমে চেতনের অনুভূতি-রাহিত্যই তখন তাঁহার মৃগ্য হইয়া উঠে। আবার, কেহ কেহ অনুভূতিরাহিত্যে অচিন্মাত্রাবস্থিতিকে 'চিন্মাত্রাবস্থিতি' বলিয়া বিবর্ত্তান্তর গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনে আত্মবুদ্ধিরূপ 'বিবর্ত্ত' হইতেই অণুচিৎ জীবের মুক্তি-পিপাসা। সুতরাং কর্ম্মপন্থী ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, উভয়েই আরোহবাদী। একজন 'ভোগী' ও অপরজন 'ত্যাগী'-নামে সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। উভয়েরই অণুচিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার লক্ষ্য করিতে না পারিলে অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষভাণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারেন না। সম্বিচ্ছক্তির অপব্যবহার-ক্রমেই ঐ ভোগী ও ত্যাগী কর্ম্ম ও ফল্গু-বৈরাগ্যকেই বহুমানন করিতে থাকেন। যে-কাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরম-মাধুর্য্যময় ঔদার্য্যবিগ্রহের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট না হন, তৎকালাবধি বিষয়-বিষ্ঠার ভোক্তা, অথবা, ভোগ-ত্যাগ-রূপ নিরস্তেন্দ্রিয়তর্পণকেই 'আদর্শ' বলিয়া মনে করেন। কালক্ষোভ্য 'বুভুক্ষা' ও 'মুমুক্ষা'—'ভোগ' ও 'ভোগত্যাগ' বিষ্ণুভক্তিতে পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানী, উভয়েরই অনিত্য চেষ্টা থাকে। ভুক্তি-পিশাচী ও মুক্তি-পিশাচী অণুচিৎ জীবের শুদ্ধপ্রতীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না। নিদ্রার প্রাগবস্থায় যেরূপ

সম্পূর্ণ শান্তির লক্ষণ দেখা যায় না, সুষুপ্তিতেই নিবৃত্তিলক্ষণ পরিস্ফুট হয়, তদ্রূপ ভোগনিবৃত্তিমূলক 'স্বরূপে অবস্থিতি'রূপ প্রকৃত-মুক্তি না হইলে জীবের আত্মবৃত্তিস্বরূপা নিত্যা হরিসেবার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা না হয়, তাহার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে 'অস্মিতা' জ্ঞাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অথবা অচিন্মাত্রাবস্থিতিতেই উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মুক্তিকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রকার-ভেদ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য বদ্ধজীবের নাই। ভোগমুক্ত জীবের কাল্পনিক শান্তির ধারণা নানা-প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয়। সুকৃতির অভাবহইতেই জীবের চিদ্ধর্ম্মের এরূপ অসদ্ব্যবহার।

ভাগবত-কথিত অবতার-বাদ ও আরোহ-বাদ

স্বতন্ত্রেচ্ছ জীব ভোগৈষণা ও ত্যাগৈষণার পাদতাড়িত হইয়া কখনও আরোহ-বাদকেই স্বীয় কল্যাণের একমাত্র 'সেতু' বলিয়া মনে করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সুকৃতিমান্ জীবের বাসুদেব-দর্শনে উপাধিগত ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তির তাড়না ভোগ করিতে হয় না। তিনি আত্মবৃত্তিতে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণরূপ অস্মিতায় স্বতন্ত্রেচ্ছ হইয়া নিত্যকাল ঈশ-সেবা-পর থাকেন। তাঁহাকে 'আরোহ'বাদিগণ 'অবরোহ' বা 'অবতার'-বাদী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু আরোহবাদী স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে তর্কপথে যাহা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা তাঁহার কখনই যে নিত্য স্থাপ্য নহে, একথাও তিনি বুঝিতে পারেন। 'কালে যে তাঁহার স্থাপ্য নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে',—এই নশ্বর-জগতের রীতি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় শ্রৌত-বাদ-দ্বারা সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। অপটু করণের সাহায্যে জীবে

'বিপ্রলিপ্সা'-প্রবৃত্তি হইতে যে 'ভ্রান্তি' অথবা 'প্রমাদ' উপস্থিত হয়, তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" (ভাঃ ১০।১৪।৩) শ্লোকটী আরোহবাদের অনৈপুণ্যই প্রকাশ করিতেছে এবং "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।৩২) "শ্রেয়ঃসৃতিম্ (ভাঃ ১০।১৪।৪) এবং "তত্তেঽনুকম্পাম্" (ভাঃ ১০।১৪।৮) শ্লোকগুলি আরোহবাদীর বক্ষে অমোঘ শেল বিদ্ধ করিতেছে এবং তৎপ্রতিকারার্থ "যমাদিভিঃ" (ভাঃ ১।৬।৩৬) ও "তথা ন তে মাধব" (ভাঃ ১০।২।৩৩) প্রভৃতি শ্লোক ভোগী ও মায়াবাদীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ জড়ীয় অবকাশের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণরূপ কার্য্যকে 'অবতারবাদ' বলা—সেবা-বিমুখের ভাগ্যহীনতারই পরিচয়-মাত্র। মায়িক রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবদ্বস্তুর অবতরণ বা অবরোহণ ঐপ্রকার নহে। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত অভিজ্ঞতা-বাদী যে সকল ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি-সাহায্যে বাস্তব-সত্যে তর্ক উপস্থাপিত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করেন, তাহাকে বাস্তব-সত্যবাদী বা অবরোহবাদী আদর করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে তাদৃশ সবলাভিমানিগণের দুর্ব্বলতাকে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন।

তর্কপথাশ্রয়ে বিপৎ-সম্ভাবনা

ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তব-সত্যের আশ্রয় ব্যতীত অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহারা শ্রৌতপন্থী,—তার্কিক নহেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে তাঁহারা সম্মান প্রদান করিলেও তাহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে অসমর্থ। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যাহাদিগকে বাস্তব-সত্য হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে, সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বের সন্ধানবিমুখ সেই জনগণকে অণুচিৎ ও বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ভক্তগণ, জড়ের সেবক বা 'মায়াবাদী' জানিয়া,

তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রার্থী বা অনুগত হইতে পারেন না। ভগবৎসেবা-পর অবরোহবাদ বা শ্রৌতপথে না চলিলে আরোহবাদী-জীব অশুদ্ধবুদ্ধি-বশতঃ অচিন্ত্যভাবময় অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর নিকট অপরাধী হইয়া সংসার-বাসনা-সাগরে নিমজ্জিত হন।

শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তের সুদুর্ল্লভতা

এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুকে উপদেশ-প্রদান-লীলার অভিনয়সূত্রে নিম্নলিখিত ভাগবত-কথার অবতারণা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ, পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি॥
তা'র মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্যজাত—অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে';
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে'॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলেই অশান্ত॥"

এই কথাগুলি-দ্বারা ভক্ত ও ভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব প্রদর্শন করিয়া চিদচিৎ-সমন্বয়বাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন।

শুদ্ধকৃষ্ণসেবার মূল, উত্তরোত্তর আধার বা ভূমিকা, আশ্রয় ও গতি এবং তাহার সংরক্ষণ-প্রণালী

পুনরায় (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ;
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করি' আরোপণ ,
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে' লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে' প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে' নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে' বা ছিণ্ডে' তার শুকি' যায় পাতা ॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ ;
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা '
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন ;
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদি উপশাখাগণ ॥

সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
শুব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিলে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন
সুখে প্রেম-ফল-রস করে' আস্বাদন॥
এই ত' পরম-ফল—পরম-পুরুষার্থ
যা'র আগে তৃণতুল্য—চারি পুরুষার্থ॥

এই উপদেশ-দ্বারা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যাভি-লাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দল ইহা বুঝিতে না পারিয়া যে বিদ্ধভক্তিতে আদর করেন, তাহা 'শুদ্ধভক্তি'-শব্দ-বাচ্য নহে। গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেরণা-ক্রমে সম্প্রতি এই শুদ্ধভক্তির প্রচার ও যাজন-কার্য্যে শ্রীগৌরের নিজজনগণ নিযুক্ত আছেন। শুদ্ধভক্তির বিরোধী প্রতীপগণ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ।

শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধভক্তিতে বিবর্ত্ত-বুদ্ধির পরিণাম

কিপ্রকারে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীরূপানুগত্বে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্ত-গণের আনন্দ বিধান করিবেন এবং শুদ্ধভক্তির চরম-তাৎপর্য্য অন্তরঙ্গা ভক্তি যাজন করিবেন,—এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারে অক্ষজ-জ্ঞানে নানা-প্রকার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের বহিরনুষ্ঠানের উপদেশকেই চরম লক্ষ্য জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রতি যে বিদ্বেষ-পোষণ দৃষ্ট হয় এবং অন্তরঙ্গ-ভক্তকৃত্যকে কল্পনা-প্রসূত জানিয়া বহিরনুষ্ঠানের

প্রতি যে সমাদর লক্ষিত হয়, তাহাতে কোন সুফল আশা করা যায় না। সাধারণ ভ্রমগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকায়—যাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রে ৪র্থ বর্ষে ঊনবিংশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাপঞ্চিক অনর্থসমূহ অপনোদন করিবার চেষ্টাগুলিতে উদাসীন হইয়া কেহ-কেহ সিদ্ধি-প্রাপ্তির ভাণ করিয়া বিপথগামী হন; আবার, কেহ কেহ অন্তরঙ্গা ভক্তির চেষ্টাগুলিকেও বাহ্যানুষ্ঠানের বিরোধিনী বলিয়া জ্ঞান করায় মহাপ্রভুর উপদেশ ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না।

মহাপ্রভু ও দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহযোগেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টের প্রচার সিদ্ধ হয়; আবার, তৎপরিহারেও কেবলা-ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া যায়। এই বৈষম্য অপনোদন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বৃত্তবর্ণ-বিচার এবং সুনীতি সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রকৃত দৈব-আশ্রম-বিচার স্বীয় লীলায় জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রকটিত করিয়াছেন; তিনি ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণবসন্ন্যাস-বিধির কখনও অমর্য্যাদা করেন নাই; আবার, তাঁহার পরমপ্রিয়পাত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উপদেশামৃতাদি' প্রয়োগ-গ্রন্থেও উহার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন এবং স্বয়ং দৈব বর্ণ ও দৈব আশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠু বিচার-প্রণালীর দ্বারা অদৈব বর্ণাশ্রমের কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভু ও কর্ম্মফলবাদ

'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্' প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের দ্বারা পরমার্থচ্যুত জনগণের পরিণতি এবং শুভাশুভ-কর্ম্মফল-ভোগের বিচার বুঝাইয়াছেন এবং তৎপ্রতিপক্ষে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর 'নামাষ্টকে' "যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি" শ্লোকের প্রচারদ্বারা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মফলভোগ-

শূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবৈষ্ণবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও বৈষ্ণবের বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃপূজার মধ্যে বৈষম্য দেখাইতে গিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়া-গমনাদি, বিপ্র-পাদোদক-সম্মান প্রভৃতি এবং দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলার পরবর্ত্তিকালে আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ন্যায় সন্ন্যাস-গ্রহণ ও বিষ্ণুসেবায় প্রতিষ্ঠিত জনগণের অদৈব শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। দৈব-বর্ণাশ্রমের অভাবে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, তাহাও সাধারণের নিকট দেখাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বিগত শতাব্দীত্রয়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে নানা-প্রকারে দুর্দ্দশা ও পরমার্থ-বাধা প্রদর্শন করাইয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট উহার অকর্ম্মণ্যতা ও পরিহারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। পরমার্থ-বিমুখ বদ্ধজীব বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তের ধুর্ বহন করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমের পুনঃ সংস্থাপন করিবার প্রেরণা-দ্বারা বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তসমাজগঠনের সুযোগ দিয়াছেন; আবার, দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহিত অদৈব-বর্ণাশ্রমের পরস্পর ভেদ এবং উৎকর্ষাপকর্ষও সকলকেই বুঝিয়া লইবার অবকাশ দিতেছেন।

মহাপ্রভু ও একায়ন-শাখীয় বৈষ্ণব-সমাজ

সত্যযুগে ফেনপ, বৈখানস, বালিখিল্য, সাত্বত প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বৈদিক একায়নশাখীয় অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং তদনুগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে পুনঃসংস্থাপন প্রভৃতিও তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠানের উপদেশের অনুকূল। শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শাস্ত্রবচন উদ্ধার করাইয়া তিনি উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করাইয়াছেন।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

মহাপ্রভু ও বৈধী হরিসেবা এবং তদীয়গণ

বস্তুতঃ পারমার্থিক-জীবনে দৈববর্ণাশ্রমের পুনঃসংস্থাপনরূপ পরমার্থ-প্রচারের বাহ্যানুষ্ঠানও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টের অন্তর্গত। শ্রীগৌর-সুন্দর গৌড়ীয়গণের মধ্যে যাহাতে তাঁহার মনোঽভীষ্ট ভগবৎসেবার সুষ্ঠু প্রবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য সদ্ধর্ম্মমূলে নানাবিধ নীতিশাস্ত্রেরও অনুমোদন করিয়াছেন; তিনি কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবার সাহায্য করেন নাই শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত গৌড়ীয়-মঠের প্রয়াসসমূহও পরমার্থের অনুকূল সমীরণেরই আবাহন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ, অর্চ্চা-বিগ্রহ, হরিকথা-কীর্ত্তন, সার্ব্বকালিকী হরিসেবা প্রভৃতিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার কোনপ্রকার কুচেষ্টাকে মহাপ্রভু কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার আশ্রিত জনগণের মধ্যে বেদানুগ-শাস্ত্রে অমিত-প্রতিভা-সম্পন্ন বহুশাস্ত্র-দর্শীর সমাবেশ হইয়াছিল, আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সেইসকল শাস্ত্রালোক সাধারণ্যে হীনপ্রভ হইয়াছে।

গৌরাশ্রিত 'গৌড়ীয়গণ' ও অধর্ম্মপঞ্চক

বর্ত্তমান-কালে নিজ-পর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়গণ কখনও পরমার্থ-পথের প্রতিপন্থী নহেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত বাহ্যা-নুষ্ঠান-পর হরিভক্তিবিলাস ও সাধন-ভক্ত্যঙ্গসমূহের পুনরায় সুষ্ঠু প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপদেই লক্ষ্য করিতেছেন। অ-পারমার্থিক সাধারণ বিশ্বাসের অনুগমনে পারমার্থিক অনুষ্ঠানসমূহে যে-সকল বাধা হইতেছে, সেইগুলি অপসারণপূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-চিত্ত-গত ভাবাবলীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবাই সকল সুকৃতিসম্পন্ন গৌড়ীয়ের যে একমাত্র কর্ত্তব্য,— ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাধা হইবে না। বৈষয়িক কপটাচার, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার-জন্যবিপর্য্যস্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-তর্পণৈষণাতিশয্যে স্ত্রীসম্বন্ধি

পাপাচরণ, অবৈধ উৎকট জিহ্বা-লাম্পট্য হইতে জাত মানবেতর-প্রাণীর মাংসভক্ষণ-স্পৃহা এবং ঈশসেবা-বৈমুখ্য-সংগ্রহের জন্য 'জাতরূপে'র সংগ্রহেচ্ছা প্রভৃতির দাস্য পরমার্থ-বিরোধী জীবকুলের মঙ্গলশংসী বলা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের ও সঙ্কীর্ত্তন-কারী গৌড়ীয়গণের মহিমা

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই প্রপঞ্চে আগত অখিল জীবগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা। নাম-নামীকে অভিন্নজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণনাম-ভজনই প্রকৃত উত্তম ভগবদ্ভজন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায় ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির গর্ব্ব-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া দশপ্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিয়া শ্রীনামসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া কোন গৌড়ীয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অপরাধসঞ্চয়-ফলে দেহারাম, দ্রবিণৈষণা, লোকসংগ্রহ, বহ্বীশ্বরবাদ ও উৎকট অবৈধ লোভের আবরণে শ্রীনামভজনে ঔদাসীন্য ও নানা-প্রকার নামগ্রহণ-ছলনারূপ কপটতা কোনদিনই গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ মাদৃশ অনভিজ্ঞের অনুরোধক্রমে জগতে হরিকথা প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আয়োজন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। এই সজ্জনদিগের চেষ্টাকে শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণ আদর করেন না।

অনধিকারী নির্জ্জনভজন-প্রয়াসীর দুর্গতি

তাদৃশ ভগবদ্বিদ্বেষী বহির্ম্মুখচেষ্টা-পর জীবগণ প্রভুর মনোঽভীষ্ট বাঞ্ছানুষ্ঠানে বাধা দিয়া স্ব-স্ব-অনর্থময় বিরূপ-নিজাভীষ্ট নির্জ্জনভজনের কল্পিত আদর্শকে বহুমানন করেন এবং তৎফলে তাঁহারা অন্তরঙ্গ-

ভক্ত-কোটি হইতে বিচ্যুত হন মাত্র। তাঁহাদের ভক্তবিদ্বেষ স্ব-স্ব-ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য হইতেই উদ্ভূত।

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর ত্রিবিধ অধিকার-ভেদ

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে আমরা কুলিনগ্রামবাসী শ্রীরামানন্দবসুর শ্রবণাধিকারে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ ভজনৈকপরতাই বিষ্ণুসেবার দ্বার বা বৈষ্ণবের কনিষ্ঠত্ব। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ মধ্যমাধিকারে ভজনের পথে অভিগমন এবং ভজনসমৃদ্ধ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে নামগ্রহণরূপ কৃষ্ণভজনপ্রয়াসারম্ভ। কেবল নাম-গ্রহণকার্য্যে শ্রুতনামেরই কীর্ত্তন হয়। নাম কীর্ত্তিত হইলেই অনর্থ অপগত হয়। এস্থলে 'অনর্থ'শব্দে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাকেই উদ্দেশ করে।

অনর্থযুক্ত ভোগি-সাধকের স্মরণ বা ইন্দ্রিয়তর্পণে ও সিদ্ধের ভজনে ভেদ

ইন্দ্রিয়-তর্পণৈষণাই অধোক্ষজ-সেবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সুতরাং তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ-কার্য্য প্রতিহত হইয়া কৃষ্ণেতর ভোগ্য মায়িক বস্তুরই পশ্চাদনুধাবন-প্রবৃত্তি ঘটায়। বৃন্দাবন-স্মৃতি ও তদ্ধাম-প্রকটিত লীলায় প্রবেশাধিকার—জড়ানুভূতির কৃত্রিম স্মরণের সহিত 'এক' নহে। ভগবানের অন্তরঙ্গা সেবা ও বাহ্য অনুষ্ঠানে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ—সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার অযোগ্য। অন্তর্দ্দশায় কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃত্রিম সাধকের অষ্টকাল-সেবার সহিত 'এক' নহে।

ফল্গু-বৈরাগ্যের তুচ্ছতা ও ব্যর্থতা

বাহ্যানুষ্ঠান ও চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-পরিবর্জ্জনে যে ফল্গু-বৈরাগ্য দেখা যায়, তাহাও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥"

গৌড়ীয়ের কৃষ্ণসেবা ও অভক্তের বণিগ্‌বৃত্তি 'এক' নহে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ এইসকল কথার মধ্যে সুপ্রবিষ্ট বলিয়া তাঁহারাই শ্রীরূপানুগ; তাঁহাদের অনুষ্ঠানকে কোন পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা নিজকৃত্যের সহিত 'সমান' জ্ঞান করিলেই তাদৃশ বিদ্বেষকারী ব্যক্তি 'নারকী'-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য হইবেন; সুতরাং অযোগ্য সুদীন মাদৃশ বরাকের পক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের অনুগমনে—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দুরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌॥"

এই শ্লোকেরই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই।

গৌড়ীয়মঠের বিরোধিগণও ব্যতিরেকভাবে গৌরসেবার সহায়

শ্রীরূপানুগগণের বিরোধি-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তগণের যে-সকল রাদ্ধান্তের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া গৌরসেবা-বিমুখতার আস্ফালন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই অপরাধফলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবেন; তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের কুবাক্যসমূহ বা কুচেষ্টা-সমূহ শুদ্ধ-সেবকগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের কোনপ্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূলাচরণ-ফলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকুল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ জানেন। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁর

দাস" এই বস্তু-সিদ্ধির কথাটী আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের প্রণালীই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়মঠের প্রচারের নিত্য আদর্শ হউক।

কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে নিত্য-পরোপকার-ব্রত-পালনের প্রার্থনা

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ গৌড়ীয়-চরণ-সেবা-বিমুখ অকিঞ্চন জীবাধম কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বগুরুগণ-সমীপে নিবেদন করিতেছে যে, গৌড়ীয়মঠবাসিগণ উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদের অনুগমনে যে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারী শ্রীরূপের নিত্যদাস্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই মহা-বদান্য গৌরসুন্দরের জগদ্বাসীকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয়-প্রদান। সেই সেবাই শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং তাহাই 'ব্যাসপূজা'। আজ কত আনন্দের সহিত গৌড়ীয়-মঠবাসিগণের নব-নবায়মান অভিনব সৌন্দর্য্যময়ী মধুর বাণী শতসহস্র কণ্ঠে জীবের দ্বারে-দ্বারে বিঘোষিত হইতেছে শুনিয়া আমাদেরও গৌরদাস্য উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে ; আমরাও হৃদয়ের সহিত—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥

—এই পরোপকার-সূচক শ্রীচৈতন্যবাণীকে মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়া আমাদিগকে গৌড়ীয়-মঠবাসিগণের নিজগণে গণনপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে সেই পরমার্থ-পথেই যেন নিত্যকাল বিচরণ করি। গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত 'ব্যাসপূজা' বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।

শ্রীগৌরধামের মহিমা

স্থান—শ্রীমহা-যোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

সময়—অপরাহ্ণ, রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

(শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৩২শ বার্ষিক অধিবেশনে)

নদীয়া-প্রকাশ শ্রীভক্তিবিনোদ

আজ বত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সেবা-কার্য্যের লীলা অভিনয় করিয়া তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা তাদৃশ সেবা-কার্য্যের বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মহতের আচরণ অনুসরণ করাকে আমাদের 'সৌভাগ্য' বলিয়াই মনে করিতেছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীধামসেবা-সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সেবার প্রতিকূলে কোন বিচার হইতে পারে, এমন কোন কথা নাই। আমরা তাঁহার সেবার অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেই বাসনা করি ;—আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও হৃদয়ে বিপুল বাসনা পোষণ করি।

'শ্রীধামে বাস' কাহাকে বলে ?

পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে'—হরিসেবা-চেষ্টা-বিহীন-স্থলে—বিলাস-বৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌর-জনের কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের এই-সকল উপদেশ তখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই ; মনে করিয়াছিলাম,—

শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগ্যবুদ্ধি উপস্থিত হইবে; ভাবিয়াছিলাম,—শ্রীধামকে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া কি-প্রকারে ভজনে পারদর্শিতা লাভ করিব? মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িব। বর্ত্তমান-সময়ে সেবার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও যাহাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলে, সেই কলিকাতা-নগরীতে শ্রীধামের সেবা-বুদ্ধিতেই সেইস্থানে যাইবার বুদ্ধি করিয়াছিলাম। এই অপবিত্র শরীর লইয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দিবার যোগ্যতা হইল না! আবার, কিরূপে শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ ও শ্রীধাম হইতে অন্যত্র গমন করিলাম, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না! শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অন্যত্র উপস্থিত হইলাম। বিলাস-বৈভবে মত্ত হইবার জন্য বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অযোগ্য সেবককে অন্যত্র আনয়ন করেন নাই,—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। শ্রীধামের কিরণ-প্রতিভাত—কিরণোদ্ভাসিত-জ্ঞানেই আমি অন্যত্র বাস করি। যাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করেন, তাঁহারা শ্রীধামের কথা, বিষ্ণু-তীর্থের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন—আলোচনা করেন, সেইসকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেইসকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম-নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র।

সর্ব্বত্র বিষ্ণুসম্বন্ধি-বৈষ্ণব-ধাম-দর্শন

সাত্বত-তন্ত্র-বাক্য যথা—

"একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

সেই ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী, সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদশায়ীও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণোদশায়ি-বিষ্ণুর অভিজ্ঞান এবং তাঁহাদের আধার-ভূমিকা যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারা যে-যে-স্থানে গমন করেন, সেই-সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপাট। কিন্তু আমি নিতান্ত সেবা বিমুখ, তাই বঞ্চিত হইয়াছি!—আমি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কলিকাতা-মহানগরীতে আছি! আবার কিরূপেই বা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি না! আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য অন্যত্র বাস করি, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাকট্য-বিধানই উদ্দেশ্য।

ভূলোকে গোলোক-দর্শন

কলিকাতা-মহানগরীও কিছু শ্রীগৌড়মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভুর সেবা-ভূমি ও সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহারভূমি 'বরাহনগর'—এই কলিকাতা-মহানগরীরই একাংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্যামমঞ্জরী' নাম্নী সখীই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। বরাহনগর—শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেস্থানে শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের মায়িক-প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগি-কর্ম্মীর নিকট ভোগভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা-মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশ্রম্ভ-সেবা-পর স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর মগ্ন।

শ্রীধাম-মায়াপুরের ও নবদ্বীপের তত্ত্ব

এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥'

শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহা-বিষ্ণুত্রয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্র-স্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মার হৃদয়। ব্রহ্মা এইস্থানে গৌর-কৃষ্ণের তপস্যা করিয়াছিলেন ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নিরস্তকুহক পরমসত্য—তাহাই বিজ্ঞান-সমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত পরমভগবজ্‌জ্ঞান—তাহাই 'বেদান্ত' বা 'ব্রহ্মসূত্র'; সূত্রের যে-ব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধি-সম্প্রদায় অন্যপ্রকারে করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা সবিশিষ্ট হইলেই শ্রীনবদ্বীপধাম অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা শ্রী-ই কমলা গৌর-নারায়ণের দক্ষিণ-পার্শ্বে বিরাজমানা; প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া বামপার্শ্বে শোভিতা, এবং লীলা বা দুর্গা-শক্তি ধামস্বরূপিণী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানপ্রতিপাদ্য-লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা।

শ্রীনামাশ্রিত সিদ্ধের প্রতীতি

শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত। তাই (চৈঃ চঃ মধ্য ১২ পঃ)—

"আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে-বনে 'এক' করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

যে-দিন গুরুকৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেইদিন অন্যরকম দেখি,—

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

সর্ব্বত্র স্বীয় গুরুদেবের বৈভব-বিলাস-দর্শন

মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা-নগরীতে বাস করিয়াও যখন গৌড়ীয়-মঠে প্রতি-হৃদয়েই শ্রীগুরুদেবের লীলা-বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয়

না যে, অচিৎমায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। তাঁহাদের কীর্ত্তনমুখে চিদ্বিলাসের বিচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইলেই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা-বৃত্তিদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন—'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না।' আমি বিধিবাধ্য হইয়া তাঁহার সেই আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু অপার-করুণার সাগর শ্রীগুরুদেব আমাকে বহুমূর্ত্তিতে কৃপা করেন—বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন—শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার ন্যায় হরিবিমুখের হৃদয়েও যে শ্রীধামস্বরূপ একেবারেই প্রতিফলিত হয় না, তাহাও নহে সশক্তিক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-প্রচার, বিধিরাজ্যের শ্রী-ভূ-লীলা-পরিবেষ্টিত গৌর-নারায়ণের পূজা-দ্বারা অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিবার সুযোগ, এবং আমার গুরু-বর্গের সেবোন্মুখী জিহ্বা হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণ প্রভৃতি—শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা-ক্রমেই সাধিত হইতেছে।

স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন

আমাতে হরিবিমুখ বৃত্তি থাকিলেও আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্! জন্মের প্রারম্ভেই শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের গৃহে আদি ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিলাম। জন্মের পূর্ব্ব হইতেও হরিকথা—বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিবার অধিকার হইয়াছিল। আমার কি সৌভাগ্য!—আমার সমগ্র-জীবনেই হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে! হরিকথাকে কোনও দিন 'বিষয়কথা' বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি নাই।

শ্রীধাম-প্রদর্শক মুল-পুরুষদ্বয় শ্রীজগন্নাথ ও তদনুগ শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার হিতৈষিবর্গ, আজ বহুভাবে শ্রীধামের সেবা ও শ্রীধামের-প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীধাম-সেবা-প্রকটের মূলপুরুষ—

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ। এইস্থান—সেই মহাজনেরই প্রদর্শিত ভূমি। তিনি এইস্থানই দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন,—ইহাই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর। তাঁহার অনুগত-দাসাভিমানী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদনুসারেই শ্রীধামসেবার লীলা অভিনয় করিয়াছেন।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্যবস্তু শ্রীধামের প্রচার

এই ধামের বিদ্বেষিগণের প্রতিকূল আচরণের ফলে জগতের সমস্ত জীব ক্রমশঃ এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণই ভগবানের অনুকূল সেবক প্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধপ্রভৃতি—কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এইসকল অঘ-বক-পূতনাদির প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে; অঘ, বক ও পূতনা-গণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই; ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। স্বার্থান্ধ শ্রীধাম-বিদ্বেষিগণও তদ্রূপ নিত্য চিন্ময়-ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না; কেননা, উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে! পরন্তু ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম-প্রচারের সহায়তাই করিবে।

শ্রীধামবিদ্বেষিগণের গতি ও পরিণাম

বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ যেরূপ নির্ব্বিশিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধাম-বিদ্বেষিগণ নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারি-শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিদ্বেষিকুল অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু গৌর-কৃষ্ণ—নিত্য, তাঁহার কাম—নিত্য, তাহার নাম—নিত্য, তাঁহার ধাম—নিত্য।

বক্তার প্রণতি-জ্ঞাপন

যাঁহারা শ্রীভগবানের কামের সেবা করিতেছেন, শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, শ্রীধামের সেবা করিতেছেন, এবং নামীর সহিত শ্রী, ভূ, লীলা-শক্তিত্রয়ের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

মহা-প্রসাদ

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠ, চিরুলিয়া, মেদিনীপুর

সময়—অপরাহ্ণ, শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৩২

প্রপঞ্চে অপ্রাকৃত বস্তুচতুষ্টয়

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"
"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

মহা-প্রসাদের সংজ্ঞা ও প্রদাতা

শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিলাম। বৈষ্ণবগণের শেষবাক্যে শুনিলাম, তাঁহারা—কৃপা-প্রসাদ-ভিক্ষু। বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু; 'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্রজগৎকে শ্রীভগবানের প্রসাদ-রূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্পত্তি আছে, তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান করিতে পারেন। যে ভগবান্ সমস্ত সম্পত্তির মালিক, সেই ভগবানের সেবা-ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁহাদের নিকট 'প্রসাদ',—জড় সুখাশা-বাদি(optimist)-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ কথা বলিতেছি না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্র-জগৎকে প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ—ভগবদ্ভক্ত-গণের প্রসাদপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত। কে ভগবানের প্রিয়তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও

ভাগ্যবিশিষ্টতার উপরই নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্বস্তু যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহা-প্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

মহা-প্রসাদ-সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত-ভেদ

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণচেতাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। ভারতীয় সামাজিক-বিচারে আমরা দুইপ্রকার মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাঁহারা কর্ম্মফল-প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও তাঁহাদিগকে অবৈধরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া কোথাও স্বীকৃত হয়; আর, (২) যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নৈষ্কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসাদগ্রহণই নিত্য-শ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্য-লাভের উপায় বলিয়া কোথাও বিশ্বাস করা হয়। একপ্রকার বিচার এই যে, হাজার-হাজার বিমূঢ় লোক যে মত পোষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ করা উচিত নহে; দ্বিতীয়প্রকার বিচার এই যে, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃত-সত্য বিচার করা আবশ্যক।

বাস্তব সত্যবস্তু ও জনমতরঞ্জন

'সত্য হউক, অসত্য হউক, অনেকগুলি লোক যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা করিব না',—এইরূপ জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'সুকৃতি' হইতে বঞ্চিত না হই। 'জনপ্রিয়তাই প্রয়োজনীয়',—এইরূপ বিচার মায়া-বিমুগ্ধ নির্ব্বুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বর-বস্তু—পরম-সত্যবস্তু। 'জনপ্রিয়তা'কে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার

মনে করিলে সত্যস্বরূপ-ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়। জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবজ্ঞার ফলে আমরা গোপনে অমেধ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হই

অমেধ্য বস্তু কখনও ভগবৎপ্রসাদ নহে

ভগবৎপ্রসাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা এবং ভগবৎপ্রসাদ যাহা নহে, তাহাতে আমাদের অনুরাগ-বৃদ্ধি হয়। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে, 'ভগবান্' নয় যাহা বা 'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা—অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন মৎস্যাদ ও পশু-পক্ষীর মাংসভোজী হইয়া পড়ি। ঐগুলি (মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য)—ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ, উহা হিংসা-মূলে উৎপন্ন আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐসকল অমেধ্যগ্রহণ-চেষ্টা দেখিতে পাই না। পতিসুখে বঞ্চিত আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণ, বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না, তাহা কখনও গ্রহণ করেন না—ইহা সামাজিকগণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলিরূপে অর্পিত পশুর মাংস যদি 'প্রসাদ' হইত, তবে চতুর্থাশ্রমী বা বিধবাদিগকেও উহা দেওয়া যাইতে পারিত! সাধারণতঃও দেখা যায় যে, কোনও ভদ্রলোক কোনও হিংসার প্রশ্রয় দেন না। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে কেন শাস্ত্রে বিধিমূলে ঐরূপ হিংসা-কার্য্যে অনুমোদন দেখা যায়?' তদুত্তরে সাত্বতশাস্ত্রসমূহ বলেন,—যাহাদের অত্যন্ত শুক্রশোণিতের জন্য লোভ রহিয়াছে, তাহাদের শুক্রশোণিতের প্রবল-বুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐসকল বিধির উদ্দেশ্য।' সুতরাং যে-যেস্থলে নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেই-সেইস্থলেই 'অমেধ্য' আমিষাদি কখনও 'ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া গৃহীত হয় না।

'মহা-প্রসাদ' ও মহা-মহা-প্রসাদে'র মহিমা

ভগবদ্দাসগণ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'ভগবানের দাস' বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্য-বস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—'ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, মাঝ-পথে একটা ঠাকুর দাঁড় করাইয়া 'ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া বোকা লোকগুলিকে ভোগা দিব'—'ভোগের আগেই প্রসাদ (?) বলিব এবং তদ্দ্বারাই সত্যস্বরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ফাঁকি দিতে পারিব', তাঁহারা—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত। এই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী—'বিশেষ-অনুগ্রহ', আর একটী—'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'। 'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'-লাভে সকলের ভাগ্য বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহা-মহা-প্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। অতএব ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

পরমার্থি-বৈষ্ণবের ও অপরমার্থি স্মার্ত্ত কর্ম্মীর মত-ভেদ

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থের সহিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিনিবন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে ;—একজনের বিচার-সম্মত-বিধি, আর একজনের দণ্ডবিধি। একজন বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরসেবার অনুকূল বস্তুসমূহ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ; সর্ব্বদা বিষ্ণুস্মরণই 'বিধি', বিষ্ণু-বিস্মরণই 'নিষেধ' ; সুতরাং বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল হইলেও উহাই 'নিষেধ' ; আর একজন বলেন,—ঈশ্বর কেহ মানুক আর নাই মানুক, দেশাচার-পদ্ধতি ও লোকাচার-পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ঈশ-মত ও জন-মত

প্রকৃতপক্ষে 'জনমতই ঈশ্বর-মত' (Vox Populi Vox Dei)—এই ন্যায়ে সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধা হইলেও তাহাতে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। 'অনেকগুলি লোক বিচারে ভুল করিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিব'—এইরূপ ন্যায় মনোধর্ম্মি-সমাজে আদরণীয় বা প্রচলিত থাকিলেও উহা আত্মবঞ্চনার প্রকার-ভেদ মাত্র।

জনমত-বিরোধি-বাস্তব সত্যের প্রচারকের প্রতি দৌরাত্ম্য

বহুপূর্ব্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে,—কোন-কোন-ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ মতই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশীয় জনৈক মনীষী যখন সমস্ত-লোকের বিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই সত্য প্রচার করিলেন যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকেই পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, তখন জনসাধারণের ঐরূপ মতবিরোধিনী সত্যকথার প্রচার-ফলে তাঁহাকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক-সময়ে 'অসত্য' বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পরেও 'জনপ্রিয়তা'র জন্য 'অসত্যই গ্রহণ করিব', এইরূপ বিচার—নীতি-বিগর্হিত।

পরমার্থিককুল বলেন,—ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্যদ্রব্যসমূহ 'কঠিন' বস্তু হইলে—'বিষ্ঠা', এবং 'তরল' বস্তু হইলে—'মূত্র' নামে অভিহিত।

ভগবান্‌কে কে ডাকিয়া খাওয়াইতে পারেন? আর কে-ই বা ডাকিতে পারেন না বা খাওয়াইবার অযোগ্য? শ্রীমদ্ভাগবত (১।৮।২৬) বলেন,—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥"

—ভগবানকে ডাকিয়া ত' খাওয়াইবেন? কিন্তু তাঁহাকে বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণ ডাক্‌তেই'যে পারে না! এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—"গৃহ্ণীয়াদ্-বৈষ্ণবাজ্জলম্" —পক্বান্নপ্রসাদ না পাইলেও বৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্ততঃ প্রসাদ-জলও লইতে হইবে।

'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব,—মনোধর্ম্ম বা গোখরত্ব

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার—জড়জগতের বস্তু-গত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১০।৮৪।১৩)—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য দ্রব্যের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করিয়াছেন,—ভগবৎপ্রসাদ হউক আর নাই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—দ্রব্যসমূহের শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার—ভোগোন্মুখ-মনেরই বিচার। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পয়ঃ-পানকারি-ব্রহ্মচারীর ও ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির চরিত্রে (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ অঃ) আমরা উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

ভ্রান্ত অবৈষ্ণব-দ্রষ্টার অস্বীকার-সত্ত্বেও অধোক্ষজ—বাস্তবসত্য

এইরূপেই পারমার্থিকব্রুব অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীতে পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয়। পরমার্থ প্রতিহত হইবার বিচার গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বিষম সাম্প্রদায়িক-ভেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পারমার্থিক-ব্রুবগণের আচরণ-দর্শনে 'পরমার্থ সত্যের বিচারও ভ্রমযুক্ত'—এইরূপ যে বিচার-প্রণালী, তাহা সুষ্ঠু নহে। কোনও বস্তু দ্রষ্টার খণ্ড-দর্শনে আসে না বলিয়াই যে তাহার কর্ত্তৃসত্তা-গত অধিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, এরূপ নহে।

সত্য পরমার্থ ও গতানুগতিক পরমার্থহীন দুষ্ট প্রথার দৃষ্টান্ত

'তাতস্য কূপঃ'—এই ন্যায়ানুসারে 'আমার ঠাকুর-দাদা এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, সুতরাং পঙ্কোদ্ধার না করিয়া আমিও বংশানুক্রমে সেই জল পান করিতে থাকিব এবং ঐ জল পান করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে আমাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্খতায় একনিষ্ঠারূপ বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিব'—এরূপ বিচার বুদ্ধিমানের বিচার নহে। 'ধামা-চাপা বিড়ালে'র গল্প অনেকেই জানেন।—'কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে বিড়ালের অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। উক্ত গৃহস্থের পুত্রের বিবাহ-বাসরে একটী বিড়াল বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিলে গৃহকর্ত্রী উহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ধামা দিয়া উহাকে চাপা দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সেই দেশের গৃহস্থমাত্রেই বিবাহ-বাসরে একটী করিয়া বিড়াল ধামা চাপা দিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন; এমন কি, যাঁহার বাড়ীতে বিড়ালের অসদ্ভাব হইল, তিনি অন্য স্থান হইতে বিড়াল ধার করিয়া আনিয়া সেই বিধি-পালনে সচেষ্ট হইলেন।' জনপ্রিয়তা-লিপ্সা-বশে অনভিজ্ঞ সমাজের আচার বা দেহধর্ম্ম ও মনো-ধর্ম্মের বিচার কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই গ্রহণ করা উচিত নহে।

মনোধর্ম্মীর ভারবাহিতা ও কপটতার দৃষ্টান্ত

মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ—ভারবাহী, তাঁহারা সারগ্রাহী নহেন। ভার-বাহিসূত্রে শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিগমন করা যায় না। মনোধর্ম্মী অসৎকে 'সৎ' ও সৎকে 'অসৎ' বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার বিচারোথ 'ভাল' ও 'মন্দ', উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম ও কপটতা-মূলক। একটী গল্প শুনা যায়,—একদা একজন ব্যবসায়ি-গুরুব্রুব শিষ্যের বাড়ী গমন করিয়া আহার করেন। গুরুর ভোজন-সমাপ্তির পর শিষ্য গুরুকে

একটী হরীতকী প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, গুরু হরীতকীটী ছাড়াইয়া দিবার জন্য শিষ্যকে আদেশ করেন। বুদ্ধিমান্ শিষ্য হরীতকীর উপরের অংশটী খোসা ভাবিয়া উহাকে ছাড়াইয়া গুরুদেবকে হরীতকীর অভ্যন্তর-ভাগ অর্থাৎ কেবল বীজাংশটী প্রদান করিলেন! গুরুমহাশয় হরীতকী-ভক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরদিন পরম গুরুভক্ত উক্ত চতুর বা নির্ব্বোধ শিষ্যমহাশয় পূর্ব্বদিনের কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া গুরুদেবকে একটী বীজহীন এলাচ প্রদান করিতে আসিলে গুরুজী দেখিলেন,—শিষ্য-প্রবর এলাচের দানাগুলি বাদ দিয়া কেবল খোসা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন!' মনোধর্ম্মীর বিচারও এইরূপ;—মনোধর্ম্মী বাস্তব-বস্তুকে 'অবস্তু' বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং অবস্তুকে 'বস্তু' বলিয়া গ্রহণ করেন।

বিপ্রলিপ্সা-দোষ ও তাহার দৃষ্টান্ত

'বিপ্রলিপ্সা' বলিয়া মানবের একপ্রকার দুর্ব্বলতা আছে; আমরা সেই জ্ঞান-কৃত পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্তার্হ। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না যে, তিনি যে-যানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাতে চাপা পড়িয়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

মহা-প্রসাদ-সম্বন্ধে স্মার্ত্তের বিচার

স্কন্দবিষ্ণুপুরাণ-বাক্য—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ॥"

—এই বাক্যটী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া ইহাকে 'বৈষ্ণবপর' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অমেধ্য অপ্রসাদের

উপর যে নিষেধ-ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি বিষ্ণুপ্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ। একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণতনয় মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেব 'চান্দ্রায়ণ-ব্রত' করাইয়াছিলেন! ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ফলে উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের ক্রমশঃ কুক্কুট-ভোজনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং তিনি রাজধানীর বিলাসভোজনাগারে গিয়া কুক্কুট-ভোজনে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। যখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ঐ ব্রাহ্মণতনয়ের ঐরূপ আচরণের কথা তাঁহার পিতৃদেবকে জানাইলেন, তখন বিচক্ষণ পিতাঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—'এখন আমার পুত্র ছেলে-মানুষ, সে বড় হইলে ঐ রোগটা কাটিয়া যাইবে!'

মহা-প্রসাদে অপ্রাকৃতবুদ্ধি—বহুসুকৃতি-সাপেক্ষ

ভগবান্ যাহাকে সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই, সে কখনও প্রসাদ-গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯ম বিঃ) আচার্য্য গোস্বামিপাদ শ্রীগোপাল ভট্টপ্রভু শ্রীপ্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিবে এবং সদাচারী ও আভিজাত্যাভিমানী কর্ম্ম-জড়গণকে অনিবেদিত দ্রব্য, সামাজিক সম্মান ও অর্থাদি প্রদানপূর্ব্বক বঞ্চনা করিবে—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥"

বিষ্ণুবিমুখগণ সর্ব্বদাই বঞ্চিত

অধোক্ষজ-বস্তুর সেবায় বিমুখ মায়া-বিমোহিত মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা—বঞ্চক ও বঞ্চিত।

যাবতীয় অদৈবপর শাস্ত্রবিধি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পারমার্থিক-শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন না; কারণ, আলোচনা করিলেই বিপদ্ উপস্থিত হইবে! কেহ কেহ ভোগ-বুদ্ধিতে ঐসকল আলোচনা করিয়াও কর্ম্মজড়ীকৃত-বুদ্ধি-বশতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রের সত্য-বাণীতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেন না। 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্বজিজ্ঞাসা' যেরূপ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের নিকট পারমার্থিকের বিচার-জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ।

নিঃশ্রেয়সার্থীর বিধি ও নিষেধ-কৃত্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

—যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি লৌকিকী বা বৈদিকী যে-কোন ক্রিয়াই করিবেন, তাহা হরিসেবার অনুকূলরূপেই করা তাঁহার উচিত। হরিসেবার প্রতিকূল-কার্য্যে আগ্রহ অত্যন্ত কর্ম্মজড়তা-বিজড়িতবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরিসেবা হয় না। হরিজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া কখনও আমরা হরি-প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। আবার, যাঁহারা মুখে নিজদিগকে 'হরিজন' বলেন, অথচ হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির আনুগত্য করেন, হরিসেবার প্রতিকূল আচরণগুলিকেই 'সদাচার' বলিয়া লোক-বঞ্চনা সাধনপূর্ব্বক 'আমাদের আচরণ অনুকরণ কর' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কোমলমতি লোকদিগকে বিপথগামী করেন, তাঁহাদের অনুগমন করিলে কখনও আমরা শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না।

ভক্তপ্রসাদ-সেবনেই ভগবৎপ্রসাদ-লাভ

যাঁহারা—সত্য-সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরিসেবা-রত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ-লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনওপ্রকারেই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না; শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন ('গুর্ব্বষ্টকে' ৮ম শ্লোকে)—

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

মহা-প্রসাদের নিত্য অপ্রাকৃতত্ব; তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হইলে নারকিত্ব

ভক্তের মুখেই ভগবান্ ভোজন করেন; (ব্রহ্মপুরাণে)—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥"

—এইসকল পারমার্থিক বিচার স্থূলবুদ্ধি স্মার্ত্তের দ্রব্যশুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারের মধ্যে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। ভগবদুচ্ছিষ্ট মহা-প্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদ অশুচি কুক্কুরাদি-কর্ত্তৃক পুনঃ উচ্ছিষ্টীকৃত হইলেও তাহা সমগ্র ভগবদ্বিমুখ অশুচিগ্রস্ত মানব বা জীব-জাতিকে পবিত্র করিতে সমর্থ; স্কন্দপুরাণে—

"কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥"

কুক্কুরের মুখ-স্পর্শে মহা-প্রসাদ অপবিত্র হইয়া যায় না;—পতিত-পাবন বস্তু কখনও স্বয়ং নিজে পতিত হইয়া যান না। এ-কথার সাক্ষ্য —শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে এখনও প্রচারিত ও বিদ্যমান।

শ্রীজগন্নাথ—জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে-স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত মহা-প্রসাদে বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদে যাঁহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত বা খণ্ডিত বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা। পদ্মপুরাণ বলেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকীঃ সঃ॥"

ভক্তি ব্যতীত পাণ্ডিত্যাদি জড়সম্পৎ হরিতুষ্টিকরী নহে

কর্ম্মজড়মতি উৎকৃষ্ট শাব্দিক বা বৈয়াকরণ মন্ত্র বা শব্দোচ্চারণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ সেই বৈয়াকরণের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত পাচিত আতপ-তণ্ডুলের ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জন প্রভৃতি কিছুই ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে-কোনরূপ অন্ন যে-কোন-প্রকারেই প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান্ প্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করেন।

নাস্তিকতার প্রকার-ভেদ ও পরিণাম

পাছে আমাদের বিষয়কথা ও গ্রাম্যকথা থামিয়া যায়,—পাছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভগবান্ আমাদের স্মৃতিপথে শ্রীহরি উদিত হইয়া পড়েন, পাছে আত্মা পবিত্র হয়,—এই ভয়ে আমরা কেহ-কেহ অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে

শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে 'উইল্‌সন্ হোটেলে'র অমেধ্য খাদ্যের প্রতি শ্রদ্ধা-যুক্ত হওয়াকেই 'গৌরবের বিষয়' বলিয়া মনে করি। আবার, কেহ-কেহ আস্তিকতার আবরণে নাস্তিকতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য পূর্ব্বেই ভগবানকে মুখ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের বিলাস প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই!—তাঁহাকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' কল্পনা করিয়া নিজেরাই 'সাকার' ও 'সবিশেষ' হইয়া এক-মাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা সেই ভগবানের ভোগ্যবস্তুগুলিকে ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হই! 'পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)—এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ হরিবিমুখ-মোহিনী মায়া-দেবী আমাদিগকে বুঝিতে দেন না। তাই আমরা ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত রূপকে অক্ষজ-জ্ঞানে মাপিতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া পড়ি! আমাদের মধ্যে কেহ-কেহ আবার—'আমরা আগে খাইব, ভগবানকে দিতে গেলে যদি আমাদের ভোগ্য গরম খাদ্যগুলি জুড়াইয়া যায়'—এরূপ কু-বিচারের অনুসরণ করিয়া ভোগের আগেই 'প্রসাদ' করিয়া বসি! কেহ কেহ আবার—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্', (ঋক্-সং ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত, ২০শ ঋক্) 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে কপ্‌চাইয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না! পরন্তু, নির্ব্বিশেষবুদ্ধি লইয়া পঞ্চোপাসক বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি এবং বিষ্ণুকেও অন্যান্য দেবতার সহিত 'সমান' বুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর অপ্রসাদকেই 'প্রসাদ' বলিয়া মনে করি! কখনও বা অন্য দেবতার প্রসাদ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর অনুকূল জানিয়া তাহাতেই আসক্ত হই! তখন শাস্ত্রের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না ; (পদ্মপুরাণে)—

'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥'

বৈষ্ণবের মনের ধারণা

সকল-জগতের সকল-বস্তুর একচ্ছত্র মালিক শ্রীভগবানেরও মালিক আবার—'তদীয়' বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি কিরূপ?—(ভাঃ ১০।১৪।৮)

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্ম-কৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

'ভগবান্ যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন'—এই সত্য ভুলিয়া গিয়া—এই বিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিপদে পতিত হই। সুতরাং যাঁহারা—ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাঁহাদের প্রসাদই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হয়; সেই ভগবৎপ্রসাদ-লব্ধ মহাজনগণের চরণে আমি প্রণত হই।

শ্রীগোবিন্দ

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠ, চিরুলিয়া, মেদিনীপুর

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ, শনিবার ২০শে চৈত্র, ১৩৩২

[নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দপ্রভুর শ্রীপাটে তদীয় প্রথম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে]

"মহাপ্রসাদে **গোবিন্দে** নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥"

অপ্রাকৃতবস্তুচতুষ্টয়ে মানবের বিশ্বাস-রাহিত্যের কারণ

বর্ত্তমানকালে এই চতুর্ব্বিধ বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে নানাবিধ অনর্থ গ্রাস করিয়াছে! 'মহা-প্রসাদ', 'গোবিন্দ', 'নাম' ও 'বৈষ্ণব'—এই চারিটী বস্তুই অভিন্ন-'বিষ্ণু'; কিন্তু আমরা মায়ার জগতে—পাপের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই বস্তুবিজ্ঞানে বিশ্বাস হারাইয়াছি! 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যাহা-দ্বারা মাপা যায়, তাহাই 'মায়া', কিন্তু উপরি-উক্ত চারিটী বস্তু মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। 'বৈষ্ণব'কে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।' আমরা অনেক-সময়ে 'শ্রীগোবিন্দ'কেও মাপিয়া লইতে চাই! এদিকে শব্দটাকে মুখে 'বৈকুণ্ঠ' ('কুণ্ঠা' অর্থাৎ মায়িকধর্ম্ম তিরোহিত যাঁহাতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত) বলি, আবার, তাঁহাকে মাপিয়া লইতেও কৃতসঙ্কল্প হই!—যে-ডালে বসিয়া আছি, সেই ডালই কাটিয়া ফেলিতে চাই!

উক্ত অপ্রাকৃত বস্তুচতুষ্টয়—মায়াতীত

চতুঃসীমাযুক্ত বস্তুকেই মাপিয়া লওয়া যায়; কিন্তু 'গোবিন্দ'প্রভৃতি বস্তুচতুষ্টয় সেই সসীম-জাতীয় বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিবার

ধৃষ্টতা করিলে উহাকে কুণ্ঠ-ধর্ম্মে প্রবেশ করাইবার চেষ্টাই দেখান হয়। তাই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—ইঁহারা সকলেই অধোক্ষজ-বস্তু,—ইঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তু,—ইঁহারা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট ও লালিত-পালিত হইয়া সম্বর্দ্ধিত হন না। 'শ্রীগোবিন্দ'—স্বতঃপ্রকাশ 'চিত্সূদয়' বাস্তব-বস্তু, অন্য আলো জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় না।

শ্রীগোবিন্দ-তত্ত্ব ; তাঁহার পঞ্চবিধ রূপ

'গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ'—'গো' অর্থে 'বিদ্যা' 'ইন্দ্রিয়', 'পৃথিবী' ও গাভি ইত্যাদি। (ঈশোপনিষৎ—১৮) "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্, বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥"

—এইসকল বেদোক্ত স্তবে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগিনী বস্তু-ধারণায় গোবিন্দের বাহিরের দিকের 'চেহারা' বর্ণিত হইয়াছে। এই-সকল স্তব-দ্বারা আমরা গোবিন্দের বিভেদাংশের কথা—কুণ্ঠ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের পরিতৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু তিনি—স্বতন্ত্র। তিনি পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্যামিরূপ ও (৫) অর্চ্চা-রূপ।

(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ

(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার রূপ নশ্বর পরি-বর্ত্তনীয় রূপ নহে—কাল্পনিক রূপ নহে ; বা তিনি আমার বিচারের বা ধারণার কারখানায় গঠিত একটী দ্রব্যবিশেষ নহেন। তিনি—স্বতঃস্বরূপ-বিশিষ্ট। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্'—মনোধর্ম্মজীবি-গণের এরূপ কাল্পনিক বিচার আদৌ স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপবিশিষ্ট অধোক্ষজ-গোবিন্দে প্রযুজ্য নহে। গোবিন্দই সমস্ত বহিঃপ্রজ্ঞা-গ্রাহ্য দেবতাগণের

পোষ্টা,—শ্রীগোবিন্দই অগ্নিকে দাহিকাশক্তি, সূর্য্যকে তেজঃশক্তি ইত্যাদি অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সকলের মূল—পরাৎপর বস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা গোবিন্দকেই 'পরমেশ্বর', 'সর্ব্বকারণ-কারণ', 'অনাদি', 'আদি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

মন-গড়া পুতুল গোবিন্দ (?) ও গোবিন্দের তত্ত্ববিৎ জ্ঞান-দাতা

কাল-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে গোবিন্দ বর্ত্তমান ছিলেন, গোবিন্দ হইতেই কালের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেক-সময়ে 'বিবর্ত্তবাদী' হইয়া মনে করি,—কালের মধ্যে 'গোবিন্দ' সৃষ্ট হইয়াছেন। আবার, কখনও বলি বা বিচার করি,—আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ সামাজিক-কারখানায় আমরা দয়া করিয়া গোবিন্দকে গড়িয়াছি!' 'আমাদের কারখানার গোবিন্দ'—'আমাদের মনের ছাঁচে গড়া গোবিন্দ'—প্রকৃত অধোক্ষজ-গোবিন্দ বা স্বরূপতত্ত্বের সহিত 'এক' নহেন; আমাদের মনগড়া বিচার-দ্বারা আমরা গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। তিনি—স্বতন্ত্র। কাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না,—তাঁহা-হইতেই কাল প্রসূত হইয়া তদ্ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গ-প্রসূত অন্যবস্তুর পরিচ্ছেদ সাধন করে। অধোক্ষজ গোবিন্দ জীবের মনঃ-কল্পিত নহেন (not a concoction of human mind)। 'গোবিন্দই একমাত্র পরমেশ্বর অধোক্ষজ-বস্তু'—ইহাই সত্য অর্থাৎ গোবিন্দই নিত্যচিন্ময়বিগ্রহস্বরূপ; সুতরাং 'জড়েন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে দৃশ্য-জগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া অচিৎএর হেয়তা, জড়ের জাড্য ও অস্বতন্ত্রতা স্বরাট্পুরুষ গোবিন্দের পাদপদ্মে আরোপিত হইতে পারে

না,—এই নিত্যসত্য যিনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন, তিনিই আমাদের পরমহিতকারী দিব্য-কৃষ্ণজ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণব-ঠাকুর শ্রীগুরুদেব।

গোবিন্দই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ

এই জড়জগৎ—গোবিন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন, অক্ষজজ্ঞানের অভ্যন্তরে গোবিন্দই অন্তর্যামিরূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। বেদোক্ত বহু-দেবতা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর আবৃত বিষ্ণুর জীবেন্দ্রিয়োপযোগী বাহ্যপরিচয়ই প্রদান করেন। যখন আমরা বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের এষণা-দ্বারা আচ্ছন্ন হই, তখনই বিষ্ণুমায়া আমাদের নিকট তত্তৎফলদাত্রী দেবতারূপে প্রকাশিত হন। শ্রীগোবিন্দ যে প্রকৃত্যতীত চিচ্ছক্তি বিশেষরূপে গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি যে সম্বিদ্বিগ্রহ, তাহা আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-পর জড়ধর্ম্ম থাকা-কালে উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দ-বিগ্রহ (Unceasing Love and Bliss-Incarnate); তাঁহাতে কোনও মিশ্র বা কেবল-চিদ্বিপরীত অচিৎ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। কিছুকালের জন্য যাহা আমাদের অক্ষজজ্ঞানে 'সত্য' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা—তাৎকালিক সত্য-মাত্র (Apparent truth বা Local truth),—উহা নিত্যসত্যবস্তু Positive বা Absolute Truth) হইতে পারে না। অনাদি-কালের বিচারে গোবিন্দের আদিতে কোনও বস্তু ছিল না। গোবিন্দসেবা-বিমুখ জনগণের দণ্ডের জন্যই জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকটিত হইয়াছে;—মানবজ্ঞানের অজ্ঞেয় জড়ের অনুভব-রাজ্যের অতীত ব্রহ্মার অহোরাত্র বা সম্বৎসর বা কল্পাদি-মাত্রও নহে—এইরূপ অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকাশিত।

গোবিন্দই সর্ব্বকারণকারণ

'কার্য্যের—ব্যক্তের—পরিণামের পিতা-মাতা কে ?—কারণ কে ?—আবার, তাহারও কারণ কে ?' ইত্যাদি বিষয়ে যখন আমরা অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি,—তাহা শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম। 'কারণ'কেই যখন 'কার্য্য' বলিয়া উপলব্ধি করি, তখন দেখি,—সকল-কারণের কারণ সেই 'গোবিন্দ' ;—ইহাই স্ব-স্বরূপের পরিচয়।

(২) পরস্বরূপ

(২) 'পরস্বরূপ' বা 'পরতত্ত্বস্বরূপ' বলিতে বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম-নাথ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ। বেদাদি নিখিলশাস্ত্র বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত ভক্তি-লোচনে বিষ্ণুর পরম পদই দর্শন করেন।

(৩) বৈভব-রূপ

(৩) বৈভবপ্রকাশ মূল-নারায়ণ বলদেবপ্রভু—আমার গোবিন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। সকল-বিষয়ের মূলকারণ—স্বয়ংরূপের বৈভব—Individualityর Propagating Prime Causeই অর্থাৎ Personal Godheadএর All-Pervading Function-holderই বলদেব ; তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁহার বর্ণ—শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। কৃষ্ণের বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্যই তিনি শিঙ্গা-ধৃক্। 'প্রকাশ' অর্থে তদ্বস্তুপরতা, এবং 'বিলাস' অর্থে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা; 'প্রভুতা' অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য, 'বিভুতা' অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতা; শ্রীবলদেব—তাদৃশ গুণবিশিষ্ট (Fountain-head or Prime Source of All-embracing, All-pervading, All-extending Energy)। এইসকল পরিভাষা পরিমিত-রাজ্যের ভাষা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহাদের প্রকৃত অর্থ কখনই সম্যগ্রূপে বুঝা যাইবে না।

'বিভু' ও 'প্রভু'—পরস্পর অন্যোঽন্যাশ্রিত। বৈভব-প্রকাশরূপে যিনি—প্রকাশমান, তিনিই 'বিভু'; আর যাঁহা হইতে তিনি প্রকাশমান, তিনিই 'প্রভু'। 'বিভু'তে ও 'প্রভু'তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। 'প্রভু'—বাসুদেব; 'বিভু'—সঙ্কর্ষণ। 'বিভুর' ও 'প্রভু'র একদিক্—তৃতীয়দর্শন প্রদ্যুম্ন; 'বিভু'র ও 'প্রভু'র অন্যদিক্—চতুর্থদর্শন অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় সকল-চতুর্ব্যূহের অংশিস্বরূপ—আদি-চতুর্ব্যূহ, এবং পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদেরই দ্বিতীয়-প্রকাশ—দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ। ইঁহারাও আদি-চতুর্ব্যূহের প্রকাশানুরূপ তুরীয় ও বিশুদ্ধ। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলদেব—মূলসঙ্কর্ষণ; পরব্যোমে সেই শ্রীবলরামের স্বরূপাংশই মহা-সঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপী প্রথমপুরুষাবতার। তিনি—রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ, গোলোক-বৈকুণ্ঠের কারণ, ভূমার কারণ ও বিশ্বের কারণ। গৌরসুন্দরের বৈভববিচারে ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই ব্রহ্মাণ্ডে 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' আখ্যায় পরিচিত হইয়া আউল, বাউল, সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়।

(৪) অন্তর্যামি-রূপ

(৪) অন্তর্যামি-রূপ—ত্রিবিধ,—(ক) প্রকৃতির অন্তর্যামী করণার্ণবশায়ী, (খ) হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী, (গ) ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামি-পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা।

(৫) অর্চ্চা-রূপ

(৫) অর্চ্চা—অষ্টবিধ (ভাঃ ১১।২৭।১২)—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ;
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥"

শ্রীগোবিন্দ অর্চ্চা-রূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া জড়বদ্ধ লোকসকল অর্চ্চার দেহ ও দেহীতে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া বঞ্চিত হয়। Henotheism অর্থাৎ

পঞ্চোপাসনা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ—পৌত্তলিকতা বা ব্যুৎপরস্তের চরম সীমা। গণদেবতা-পূজা হইতে বৌদ্ধ শাক্যসিংহ-বাদ প্রসূত হইয়াছে। 'ললিত-বিস্তর'-গ্রন্থে তেত্রিশ-কোটি গণদেবতার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে শাক্যসিংহকে বর্ণন করা হইয়াছে। জড়জগতে বর্ত্তমান-সময়ে কৃষ্ণ-জ্ঞানহীন বদ্ধজীবগণ—মাটীয়া-বুদ্ধিতে মাটির পূজায় ব্যস্ত। অধিকাংশ লোকই মাটিয়া (materialist) বা জড়োপাসক এবং পঞ্চোপাসক (Henotheist) অর্থাৎ চিজ্জড়সমন্বয়বাদী।

ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তির কৃপাই সমস্তবাহ্যজ্ঞানের কবল হইতে জীবকে অপসারিত করিতে পারেন। বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-হীন পূজা-বঞ্চিত ব্যক্তিই অর্চ্চক। ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা, রামচন্দ্রের পূজা অপেক্ষা বজ্রাঙ্গজীর পূজা—বড়। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া—বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুপূজার আবাহন করিলে কয়েকদিন পরে চিজ্জড়নির্ভেদ-বাদী অথবা ব্যুৎপরস্ত বা 'পৌত্তলিক' হইয়া যাইতে হয়। 'অর্চ্চন'—বাহ্য উপচার-মুখে এবং 'ভজন'—ভাবপথে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের নামভজনের বিষয়ে উপলব্ধি নাই, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পূজার বিধেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না।

তত্ত্বতঃ গোবিন্দের সকল মূর্ত্তিই এক বা অভিন্ন, কেবল শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্য-ভেদ মাত্র

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্বরূপ, সকলেই সমানধর্ম্মা—মূলদীপ হইতে যেরূপ বহু দীপের প্রজ্বলন, তদ্রূপ ; মূলদীপ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, প্রথম দীপ হইতে প্রজ্বলিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদি যে-কোনও একটী দীপ—সমস্তবস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম বিষ্ণুবিগ্রহের যে-কোনও একটী স্বরূপের সহিত অপর বিষ্ণু-

বিগ্রহের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলা-গত বৈচিত্র্য-ভেদ-মাত্র। কিন্তু বিষ্ণু হইতে বিকৃত হইয়া যদি ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন, তবে তাদৃশ বহির্দ্দর্শনকে 'আবরণ' বা 'গুণাবতার' জানিয়া তাঁহাকে আর বিষ্ণুর সহিত সমতত্ত্বে গণনা করা যাইতে পারে না; যেমন, দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হইলে, দধিকে আর দুগ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষীরোদকশায়ি-পর্য্যন্ত দুগ্ধোপম অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্ব। ক্ষীরকে অম্ল-সংযোগে বিকৃত করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যে-স্থলে বিষ্ণুত্বের সহিত মানবের কাল্পনিক জ্ঞান মিশাইবার চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, সেস্থানেই Henotheism বা পঞ্চোপাসনা।

শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ

স্থান—বাখরাবাদ, মেদিনীপুর

সময়—অপরাহ্ণ, সোমবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৩২

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা-দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনের সম্মুখে)

বক্তার দৈন্যোক্তি

আমি—একটী নিতান্ত অযোগ্য জীব। অযোগ্য হইলেও আমার কৃষ্ণকৃপাকাঙ্ক্ষারূপ একটী কৃত্য আছে। যাঁহার যে-পরিমাণ অযোগ্যতা, তাঁহার প্রতি ভগবানের করুণা তত অধিক-পরিমাণে বর্ষিত ;—'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।'

ভগবানের শ্রীরূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদেরও রূপবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার সর্ব্বমোহন রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়া চাই,—তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করেন। শ্যাম দেখেন শ্যামার রূপ, শ্যামা দেখেন শ্যামের রূপ—উভয়ের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান পরস্পরের রূপের দর্শন-লাভ ঘটে। আমরা যদি গুণী হই, তাহা হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব।

সগণ-বার্ষভানবীর দয়িত সর্ব্ব-রস-ময় শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে)—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

শুদ্ধসেবা-রূপ রূপের দ্বারাই কৃষ্ণ আকৃষ্ট

১। শ্যামা, ২। ললিতা, ৩। বৃন্দাবনেশ্বরী, এবং শ্যামার অনুগা, ললিতার অনুগা, শ্রীরাধার অনুগা—পরপর পর্য্যায়। রূপের সেবায় যদি তাদৃশ

আনুগত্য আসে—যদি আমাদের উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়—আমরা যদি সর্ব্বসৌন্দর্য্যাকর শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমাদের উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারি, তবে আমরাও তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব।

কৃষ্ণসেবেতর অনর্থই কুরূপ

বর্ত্তমান-কালে অনর্থময় অবস্থায় দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের ন্যায় আমাদের রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত দর্শন করিবার অধিকার হয় না। আমাদের কুরূপ কোথা হইতে আসিল? আমাদের স্বরূপে ত' কুরূপ নাই! বাহিরের অনর্থ আসিয়াই আমাদের নিজের সুরূপ আবৃত করিয়াছে;—যে রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি বিধান করিব, আমাদের সেরূপ এখন আচ্ছাদিত হইয়াছে।

প্রেমভক্তি—সাধারণী শুদ্ধভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। ভগবানের শ্রীরূপ-গুণ-লীলায় পৌঁছিতে হইলে, আমার একটা কৃত্য আছে, কিন্তু আমি তাহাতেই অযোগ্য! শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রপঞ্চে ৪৮ বৎসর প্রকটকালে স্বয়ং ভজনীয় বস্তু হইয়াও ভক্তের বিচার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কি-প্রকারে জীবগণ ভগবদ্ভজনের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন, তিনি তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনারা সেই আদর্শে ভজনের প্রকার জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"

শ্রীরূপের আনুগত্যই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-লাভের মূল কারণ

শ্রীরূপানুগগণও বলেন,—আমার প্রভুই শ্রীরূপ। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তবুও আমার দাস্য-নামে একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগ শ্রীঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই-নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ' মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥"

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ গৌরানুগত্যেই শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা-লাভ-সম্ভাবনা

আমি অযোগ্য হইলেও পরম-ভাগ্যবান্! পূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগের কৃত্য বলিয়াছেন। আমার কৃত্য-পরিচয়ে বলি যে, আমিও যখন রূপানুগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন আমারও রূপানুগগণের পদানুসরণরূপ একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগগণ—প্রচারক। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ও আজ্ঞা আমি শ্রবণ করিয়াছি (চৈঃ ভাঃ মধ্য ও চৈঃ চঃ আদি ও মধ্য),—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

* * *

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥"
"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার ॥"

প্রপঞ্চে কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ, এবং কীর্ত্তন বা ভজনের যোগ্যতার লক্ষণ

জগতে মায়ার কথা প্রবলবেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ! হরিকথার শ্রবণে বা কীর্ত্তনে লোকের আদৌ উৎসাহ নাই! ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইলে 'পরম-ধর্ম্ম' হইবে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে নষ্ট করিলেও 'পরম-ধর্ম্ম' হইবে না; (ভাঃ ১১।২০।৮),—

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

—বেশী বৈরাগ্যেও হইবে না, কম বৈরাগ্যেও হইবে না; পরন্তু, যুক্ত-বৈরাগ্যাশ্রয়ে ভগবানেরই সেবা করা চাই।

যে-সকল মহাপুরুষ ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের কাছে হরিকথা বলিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতা—আমা-অপেক্ষা অনেক-গুণে বেশী। আমি—কৃষ্ণেতর বিষয়কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত! তবে গুরুদেবের নিকট হইতে শুধু যে-সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাহা আপনাদের কার্য্যে লাগে না, আপনাদের সময় নষ্ট হয় মাত্র!

কৃষ্ণনামাশ্রয়-মহিমা ; ঐকান্তিক কৃষ্ণনামাশ্রয়েই অনর্থ-নিবৃত্তির পর কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা রূপে শ্রীনামেরই ক্রমস্ফূর্ত্তি

এই জগতে বিমুখ-জীবকুলের ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহাতে তিনি সুপ্রাপ্য হন, তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয়-দ্বারাই ক্রমশঃ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি-লাভ হয় সেই শ্রীরূপেরই প্রিয়কিঙ্কর প্রভুপাদ শ্রীল জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, (ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যায়),—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত,সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীনামই প্রেমের কলিকাস্বরূপ, ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-স্বরূপে প্রকাশিত হন এবং বস্তু-সিদ্ধিকালে স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীনামগ্রহণ-ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন-পথ নাই ; (ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যায়)—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা,তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগে-নৈব কর্ত্তব্যা।" 'নাম' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে—'নামাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শুদ্ধচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রার্থী হইয়া 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি'-পাঠের সুষ্ঠু অধিকার লাভ করিতে পারিব।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোক)—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥"

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নামটী—একবার মধুর, বিগ্রহটী—দুইবার মধুর, বদনটী—তিনবার মধুর, আর হাস্যটী—চারিবার মধুর; শ্রীকৃষ্ণের চারিবার মধুর এই হাস্যটী—তুরীয় প্রাপ্য বস্তু।

দশ নামাপরাধ দূরীভূত হইলে নামাভাসের পর শুদ্ধ শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিতেই সর্ব্বানর্থ-নাশ ও সর্ব্বশুভোদয়

গোপীজনবল্লভকে—শ্রীরূপপাদের আরাধ্য সেই শ্রীরাধাগোবিন্দকে—আমরা অনেক-সময়ে জড়জগতের কোন খণ্ডিত বস্তু বলিয়া মনে করিয়া 'অপরাধ' করি। নামাপরাধহেতু 'নাম' হয় না এবং 'নাম' হয় না বলিয়া প্রেমোদয় হয় না, এবং কৃষ্ণের সেই চারিবার মধুর হাস্যটীও দেখিতে পাই না! যাহাতে আমরা অপরাধ না করি, তজ্জন্য আমাদের শুরু-পাদপদ্ম হইতে 'অপরাধ-দশক' শ্রবণ করা আবশ্যক। অনবধানতা-রূপ করালবদন অসুর আমাদিগকে গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ ভীষণ সাগরে নিমজ্জিত করে; তখন নাম(?)-গ্রহণ আকাশকুসুমের ন্যায় হয়। যাহাদের শ্রীনামে প্রাকৃতবুদ্ধি, তাহাদেরই নামগ্রহণে যত্ন হয় না। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥"

যেমন পিত্তোপতপ্ত-রসনাতে মিশ্রী ভাল লাগে না, তদ্রূপ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরও 'শ্রীনাম' ভাল লাগে না—শ্রীনাম-ভজনে আগ্রহ হয় না

শ্রীনাম গ্রহণ-ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অনর্থ থাকা-কালে আমাদের নাম-গ্রহণ হয় না। অধিক-স্থলেই 'নামাপরাধ', দৈবাৎ কদাচিৎ কখনও 'নামাভাস' হইতে পারে। অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবানকে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়;—অন্য কোন উপায় নাই।

"হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বক্তার পুনর্দ্দৈন্যোক্তি

যেমন বন্ধ্যার নিকট পুত্রকামনা নিষ্ফলতায় পরিণত হয়, আমার নিকটও তদ্রূপ ফল-লাভাশা—দুরাশা-মাত্র। আপনাদের শ্রুতিসুখকর করিয়া কোন কথা আমি আপনাদের নিকট বলিতে পারি না। কৃপা করুন,—যেন আমি কোন-দিন আপনাদের সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে পারি।

দ্বিতীয় খণ্ড



শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রত্রয়

১। "THE HARMONIST OR SHREE SAJJANA-TOSHANI"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিকপত্র। এক্ষণে ইংরেজী-ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি-দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পরিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই পত্রিকার প্রবন্ধরাজির ন্যায় উৎকৃষ্ট পারমার্থিক প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা—ডাকমাশুল-সহ অগ্রিম ৩৲ তিন টাকা মাত্র

২। "গৌড়ীয়"—পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুশিক্ষিত অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞানী গোস্বামি-শাস্ত্রে সুনিপুণ ভজনপরায়ণ সাহিত্যিকবর্গের লেখনীপ্রসূত নিত্যকল্যাণময়-রচনাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ। বাঁধাইয়া মহামূল্য সম্পত্তির ন্যায় সুরক্ষিত করিবার যোগ্য। আবার ভক্তিপথে যে-সকল আপত্তি ও প্রশ্ন আসিতে পারে, তাহা ও গত ৯ বৎসরে সুমীমাংসিত হইয়া আসিতেছে। বার্ষিক ভিক্ষা—ডাকমাশুল সহ অগ্রিম ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ডবলক্রাউন ৮ পেজী দুই ফর্ম্মা আকারে বৎসরে ৫০ খণ্ড পাইবেন। প্রতিখণ্ডের ভিক্ষা—/০ এক আনা মাত্র। যে-কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়

৩। "নদীয়া-প্রকাশ"—নদীয়ার, তথা বঙ্গের, তথা ভারতের পারমার্থিক সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গের মফঃস্বলে একমাত্র বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্র। শ্রীধাম-মায়াপুর-স্থিত-পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় প্রত্যহ নদীয়ার ও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ও ধর্ম্মকথা আলোচনা পাইতে পারেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর লেখনীতে বিভূষিত। বার্ষিক ভিক্ষা—সডাক অগ্রিম ৯৲ নয় টাকা, নগদ ভিক্ষা—৫ এক পয়সা মাত্র।